মাসিক
আল-আবরার
The Monthly AL-ABRAR
রেজি. নং-১৪৫ বর্ষ-৫, সংখ্যা-০১

الأبرار
مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ইং, জুমাদাল উলা ১৪৩৭ হি., মাঘ ১৪২২ বাং

جمادى الاولى ١٤٣٧ﻫ فبرائر ٢٠١٦م

প্রতিষ্ঠাতা
ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (রহমতুল্লাহি আলাইহি)

প্রধান সম্পাদক
মুফতী আরশাদ রহমানী

সম্পাদক
মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক

নির্বাহী সম্পাদক
মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

সহকারী সম্পাদক
মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
মুহাম্মদ হাশেম

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা
মুফতী এনামুল হক কাসেমী
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী

সার্কুলেশন বিষয়ে যোগাযোগ
০১১৯১৯১১২২৪

বিনিময় : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র
প্রচার সংখ্যা : ১০,০০০ (দশ হাজার)

যোগাযোগ
সম্পাদনা দফতর
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফকীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোন : ০২-৮৪০২০৯১, ০২-৮৮৪৫১৩৮
ই-মেইল : monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েব : www.monthlyalabrar.wordpress.com
www.facebook.com/মাসিক-আল-আবরার

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২
পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে :.............................. ৩
পবিত্র সুন্নাহ থেকে :
‘ফাজায়েলে আমাল’ নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-১৪..... ৪
দরসে ফিকহ
পোশাক-পরিচ্ছদ : আহকাম ও মাসায়েল-৪......... ৭
মুফতী শাহেদ রহমানী
হযরত হারদুয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী ১২
ইফাদাতে ফকীহুল মিল্লাত :
একটি সর্বগ্রাসী ফেতনা ও তার প্রতিকার.............. ১৩
ঘুষ : একটি পুরনো অভিশাপ........................ ১৫
মুফতী রিদওয়ানুল কাদির
মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-২৪....... ১৮
মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার ২০........২২
মাও. ইজহারুল ইসলাম আলকাওসারী
জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ২৪
হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) স্মরণে
বিশ্বখ্যাত উলামায়ে কেরামের বেদনাহত অভিব্যক্তি... ২৭
মুফতী জামীল আহমদ দা.বা.
ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর ইন্তেকালে
জাতি একজন দরদি ও দূরদর্শী অভিভাবক হারাল.... ৩৩
মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক
আমার স্মৃতিতে হযরত ফকীহুল মিল্লাত রহ.......... ৩৮
মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী
জামিয়া পটিয়ায় হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) স্মরণে
‘যিকরে খায়র’ ও দু‘আ মাহফিল........................ ৪৫
মাও. রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক: ০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক: ০১১৯১২৭০১৪০ সহকারী সম্পাদক: ০১৮৫৫৩৪৩৪৯৯
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯, সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১১৯১৯১১২২৪

সম্পাদকীয়

সায়্যিদ শাহ আব্দুল মজীদ নদীম (রহ.)-এর ইন্তেকালে বিশ্ব একজন মহান আওলাদে রাসূল (সা.)-কে হারাল

খতীবে ইসলাম, হযরতুল আল্লাম সায়্যিদ আব্দুল মজীদ নদীম (রহ.) গত ৩ ডিসেম্বর ২০১৫ ইং চলে গেছেন আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

এই মহামনীষীর ইন্তেকালে আমরা শোকাহত, বেদনাহত এবং দুঃখকাতর। আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করি। আল্লাহ তা'আলা যেন তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করেন। তাঁর ছেলে-সন্তান, পরিবার-পরিজন এবং ভক্ত-অনুরক্তদের সবরের তাওফীক দেন এবং উত্তম স্থলাভিষিক্ত দান করেন।

সায়্যিদ আব্দুল মজীদ নদীম সাহেব (রহ.) আওলাদে রাসূল ছিলেন, জগদ্বিখ্যাত মুফাসসিরে কোরআন ছিলেন, সীরতে রাসূল (সা.)-এর অনন্য ব্যাখ্যাদাতা ছিলেন, পবিত্র কোরআনের অদ্বিতীয় কারী ছিলেন, সাচ্চা আশেকে রাসূল (সা.) ছিলেন, বিশ্বনন্দিত খতীব ছিলেন, মুখলেস দাঈ ছিলেন, রূহানিয়্যাত জগতে অন্যতম রাহবার ছিলেন এবং প্রখর রাজনীতিবিদও ছিলেন। যে পথেই তিনি পা বাড়িয়েছেন সফল হয়েছেন, বিজিত হয়েছেন। দুনিয়ার প্রায় এমন কোনো দেশ নেই, যে দেশ তাঁর ছোঁয়ায় ধন্য হয়নি।

বাংলাদেশের কথাই বলি। তিন দশকের অধিক সময় থেকে তিনি এ দেশের মুসলমানদের সাথে পরিচিত। হযরত ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.) দেশব্যাপী সুন্নাতে নববীর প্রচার-প্রসারে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা নামে একটি সংস্থার গোড়াপত্তন করেন ৩০ বছর পূর্বে। এই সংস্থার অধীনে দেশের প্রায় বড় বড় জেলা শহরসমূহে আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন আয়োজন করা হতো প্রতিবছরই, যা আরম্ভ হয়েছিল ১৯৮৬ সালে চট্টগ্রামের সার্কিট হাউস ময়দান হতে। সুন্নাতের প্রচার-প্রসারের এই দীর্ঘ অধ্যায়ের শিরদাঁড়া ছিলেন সায়্যিদ আব্দুল মজীদ নদীম সাহেব (রহ.)। সুন্নাতের প্রচার-প্রসার এবং দ্বীনি দাওয়াতের খাতিরে ৩০ বছর থেকে বেশি সময় টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া তথা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত চষে বেড়িয়েছেন এই মহান ব্যক্তিত্ব। একবার বাংলাদেশে আগমন করলে প্রায় এক-দেড় মাস পর্যন্ত অবস্থান করেছেন তিনি।

আজ ফেব্রুয়ারি মাসের আগমনী পথে দাঁড়িয়ে এসব ভাবতে হৃদয় কাঁপছে, শিউরে উঠছে শরীরের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

ফেব্রুয়ারি মাস এলে এ দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ প্রতীক্ষায় থাকতেন কখন জানি আল্লামা নদীম সাহেবের দেখা হবে, হযরত ফকীহুল মিল্লাত মঞ্চে উপবিষ্ট থাকবেন। আল্লামা নদীম সাহেবের সুমধুরকণ্ঠি কোরআন তেলাওয়াতে হৃদয়ের তারে তারে হেদায়াতের আলো চমকিত হবে। তাঁর ভাবগম্ভীর বয়ান এবং 'আল্লাহ'হী'র যিকিরে প্রকম্পিত হবে পুরো দেশের আকাশ-বাতাস।

আজ আমাদের মাঝে এগুলো সবই স্মৃতি। কোন দিকটি বলব, ভেবে পাই না। গত ১০ নভেম্বর হযরত ফকীহুল মিল্লাত বিদায় নিয়ে গেলেন। একজন মুহিব্বীন বলেছিলেন, সতর্ক থেকো, ওলী-আল্লাহগণ যাওয়ার সময় একা জান না। সাথে অনেককে নিয়ে যান। ক্ষণে ক্ষনে তাঁর এই কথাগুলো মনে পড়ছে।

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর মুহিব্বীনদের একজন ছিলেন প্রায় ৫ বছর থেকে সজ্জাশায়ী। আল্লাহর রহমত হায়াত যত দিন ছিল তিনি জীবিত ছিলেন। আল্লাহর কারিশমা হযরতের ইন্তেকালের কিছুক্ষণ পরই তাঁর ইন্তেকাল হলো। হযরতের সাথেই তাঁর জানাযা হলো। এর এক সপ্তাহ না যেতেই হযরতের আরেক মুহিব্বীন যিনি হযরত এবং হযরতের মেহমানদের জন্য প্রায় শুক্রবার নাশতার ইন্তেজাম করতেন। হযরত নিষেধ করলেও করতেন। তাঁর ইন্তেকাল হয়ে গেল।

হযরতের ইন্তেকালের খবর পেয়ে সায়্যিদ আব্দুল মজীদ নদীম সাহেব ফোন করে খুবই কেঁদে ছিলেন। যারপরনাই শোকাহত হয়েছেন। তিনিও হয়তো মনে করেছিলেন এবার ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশে যাওয়া হলে ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন এবং প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষক ও মুহিব্বীনদের বিভিন্ন উপদেশ-নসীহতের মাধ্যমে সান্ত্বনা দেবেন। তাদের সবরের তালকীন করবেন। আল্লাহর হুকুম হযরতের ইন্তেকালের এক মাস না যেতেই তিনিও চলে গেলেন আল্লাহর সান্নিধ্যে।

'আল-আবরার' পরিবারের কী হাল! গত ফেব্রুয়ারি ২০১২ ইং মাসিক আল-আবরারের প্রথম যাত্রা। চট্টগ্রাম জমিয়তুল ফালাহ ময়দানের সম্মেলনে আল্লামা সায়্যিদ আব্দুল মজীদ নদীম সাহেব (রহ.) নিজ হাতে আল-আবরারের প্রথম সংখ্যাটির উদ্বোধন করে দিয়ে বলেছিলেন এই পত্রিকার উপকারিতা কেয়ামত অবধি দীর্ঘায়িত হোক।

এটি মাসিক আল-আবরারের পঞ্চম বর্ষের উদ্বোধনী সংখ্যা। আজ এর প্রতিষ্ঠাতা হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)ও নেই এই পত্রিকার সফল উদ্বোধক সায়্যিদ আব্দুল মজীদ (রহ.)ও দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন।

হে আল্লাহ! যাঁরা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন তাঁদের মাগফিরাত করুন, মর্যাদা বুলন্দ করুন, আমাদের সবরের তাওফীক দান করুন। আমীন।

আরশাদ রহমানী
ঢাকা।
২৯/০১/২০১৬ ইং

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٥١) وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (٥٢) فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (٥٣) فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ (٥٤) أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ (٥٥) نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ (٥٦)

৫১. হে রাসূলগণ, পবিত্র বস্তু আহার করুন এবং সৎ কাজ করুন। আপনারা যা করেন, সে বিষয়ে আমি পরিজ্ঞাত।

৫২. আপনাদের এই উম্মত সব তো একই ধর্মের অনুসারী এবং আমি আপনাদের পালনকর্তা। অতএব আমাকে ভয় করুন।

৫৩. অতঃপর মানুষ তাদের বিষয়কে বহুধা বিভক্ত করে দিয়েছে। প্রতিটি সম্প্রদায় নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে আনন্দিত হচ্ছে।

৫৪. অতএব তাদের কিছুকালের জন্য তাদের অজ্ঞানতায় নিমজ্জিত থাকতে দিন।

৫৫. তারা কি মনে করে যে আমি তাদেরকে ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে যাচ্ছি,

৫৬. তাতে করে তাদেরকে দ্রুত মঙ্গলের দিকে নিয়ে যাচ্ছি? বরং তারা বোঝে না।

كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

طيبات এর আভিধানিক অর্থ পবিত্র ও উত্তম বস্তু। ইসলামী শরীয়তে যেসব বস্তু হারাম করা হয়েছে, সেগুলো পবিত্রও নয় এবং জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে উত্তম বা কাম্যও নয়। তাই طيبات দ্বারা শুধু বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে পবিত্র হালাল বস্তুসমূহই বুঝতে হবে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে পয়গম্বরগণকে তাঁদের সময়ে দুই বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক. হালাল ও পবিত্র বস্তু আহার করো। দুই. সৎকর্ম করো। আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বরগণকে নিষ্পাপ রেখেছিলেন। তাঁদেরকেই যখন এ কথা বলা হয়েছে, তখন উম্মতের জন্য এই আদেশ আরো পালনীয়। বস্তুত আসল উদ্দেশ্যও উম্মতকে এই আদেশের অনুগামী করা।

আলেমগণ বলেন, এ দুটি আদেশকে একসাথে বর্ণনা করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে সৎকর্ম সম্পাদনে হালাল খাদ্যের প্রভাব অপরিসীম। খাদ্য হালাল হলে সৎকর্মের তাওফীক আপনাআপনি হতে থাকে। পক্ষান্তরে খাদ্য হারাম হলে সৎকর্মের ইচ্ছা করা সত্ত্বেও তাতে নানা বিপত্তি প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। হাদীসে আছে, কেউ কেউ সুদীর্ঘ সফর করে এবং ধূলি ধূসরিত থাকে। এরপর আল্লাহর সামনে দু'আর জন্য হাত প্রসারিত করে 'ইয়া রব ইয়া রব' বলে ডাকে; কিন্তু তাদের খাদ্যও হারাম এবং পানীয়ও হারাম। পোশাকও হারাম দ্বারা তৈরি এবং হারাম পথেই তাদের খাদ্য আসে। এরূপ লোকদের দু'আ কিরূপে কবুল হতে পারে। (কুরতুবী)

এ থেকে বোঝা গেল যে ইবাদত ও দু'আ কবুল হওয়ার ব্যাপারে হালার খাদ্যের অনেক প্রভাব আছে। খাদ্য হালাল না হলে ইবাদত ও দু'আ কবুল হওয়ার যোগ্য হয় না।

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً

امة শব্দটি সম্প্রদায় ও কোনো বিশেষ পয়গম্বরের জাতির অর্থে প্রচলিত ও সুবিদিত। কোনো সময় তরিকা ও দ্বীনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন وجدنا آباء نا على امة আয়াতে দ্বীন ও তরিকা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও এই অর্থ বোঝানো হয়েছে।

فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا

زبر শব্দটি زبور এর বহুবচন। এর অর্থ কিতাব। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে আল্লাহ তা'আলা সব পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতকে মূলনীতি ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একই দ্বীন ও তরিকা অনুযায়ী চলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু উম্মতগণ তা মানেনি। তারা পরস্পর বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ তরিকা ও কিতাব আলাদা করে নিয়েছে। زبر শব্দটি কোনো সময় زبرة এরও বহুবচন হয়। এর অর্থ খণ্ড ও উপদল। এখানে এই অর্থই সুস্পষ্ট। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে তারা বিশ্বাস ও মূলনীতিতেও বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। মুজতাহিদ ইমামগণের শাখাগত মতবিরোধ এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ এসব মতবিরোধের ফলে দ্বীন ও মিল্লাত পৃথক হয়ে যায় না এবং এরূপ মতভেদকারীদেরকে ভিন্ন সম্প্রদায় বলে অভিহিত করা হয় না। এই ইজতেহাদী ও শাখাগত মতবিরোধকে সাম্প্রদায়িকতার রং দেওয়া মূর্খতা, যা কোনো মুজতাহিদের মতেই জায়েয নয়।

উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

কোরআন মজীদের পর সর্বাধিক পঠিত কিতাব

ফাজায়েলে আমাল নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-১৪

ফাজায়েলে আমালে বর্ণিত হাদীসগুলো নিয়ে এক শ্রেণীর হাদীস গবেষকদের (!) অভিযোগ হলো, হাদীসগুলো সহীহ নয়। এগুলোর ওপর আমল করা যাবে না ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবতা কী? এরই অনুসন্ধানে এগিয়ে আসে মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা ঢাকার উচ্চতর হাদীস বিভাগের গবেষকগণ। তাঁদের গবেষণালব্ধ আলোচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছে মাসিক আল-আবরার। আশা করি, এর দ্বারা নব্য গবেষকদের অভিযোগগুলোর অসারতা প্রমাণিত হবে। মুখোশ উন্মোচিত হবে হাদীসবিদ্বেষীদের।

হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীকের কাজটি আরম্ভ করা হয়েছে ফাজায়েলে যিকির থেকে। এখানে ফাজায়েলে যিকিরে উল্লিখিত হাদীসগুলোর নম্বর হিসেবে একটি হাদীস, এর অর্থ, তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে। উক্ত হাদীসের অধীনে হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) উর্দূ ভাষায় যে সকল হাদীসের অনুবাদ উল্লেখ করেছেন সেগুলোর ক্ষেত্রে (ক. খ. গ. অনুসারে) বাংলা অর্থ উল্লেখপূর্বক আরবীতে মূল হাদীসটি, হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে।

ফাজায়েলে যিকির দ্বিতীয় অধ্যায় :

হাদীস নং-২৯ :

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اسْمُ اللهِ الْأَعْظَمُ فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ (وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ) (البقرة١٦٣ :)، وَفَاتِحَةِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ :(الم اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) (آل عمران٢ :)

(২৯) হযরত আসমা (রা.) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলার বড় নাম (যাহা সাধারণত ইসমে আজম নামে প্রসিদ্ধ) এই দুই আয়াতের মধ্যে রয়েছে। (যদি উহা এখলাসের সাথে পড়া হয়) :

وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ (সূরা বাকারা, রুকূ-১৯) এবং

الم اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (সূরা আলে ইমরান, রুকূ-১)। (দুররে মানসূর : আবু দাউদ, তিরমিযী)

(মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/২৭২ হা. ২৯৯৭৬, মুসনাদে আহমদ ৬/৪৬১ হা. ৭৬৮০, সুনানে দারেমী ২/৯৭ হা. ৩২৬৬, সুনানে আবুদাউদ ১/২১০ হা. ১৪৯৬, জামেউত তিরমিযী ২/১৮৫ হা. ৩৪৭৮, সুনানে ইবনে মাজাহ ২/২৭৪ হা. ৩৮৫৫)

হাদীসটি হাসান।

ক.

হযরত আনাস (রা.) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন, অবাধ্য ও অনিষ্টকারী শয়তানের জন্য এই দুটি আয়াতের চেয়ে কঠিন আর কোনো আয়াত নেই।

والهكم اله واحد

হতে আরম্ভ করে উপরোল্লিখিত আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

ليس شئ اشد على مودة الجن من هولاء الآيات التى فى سورة البقرة والهكم اله واحد

(মুসনাদে দায়লামী ৩/৩৮৫ হা. ৫১৭৭, তাফসীরে দুররে মানসূর ১/১৬৩, কানযুল উম্মল ১১/৫৬৭)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

হাদীস নং-৩০ :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَفِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ، أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ :لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ أَوْ ذَكَرَنِي أَوْ خَافَنِي فِي مَقَامٍ . هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَا قَوْلَهُ مَنْ ذَكَرَنِي أَوْ خَافَنِي فِي مَقَامٍ .وَقَدْ تَابَعَ أَبُو دَاوُدَ، مُؤَمَّلًا عَلَى رِوَايَتِهِ وَاخْتَصَرَهُ

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ ফরমান, (কেয়ামতের দিন) আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন, জাহান্নাম হতে এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে বের করে নাও যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে এবং তার অন্তরে বিন্দু পরিমাণও ঈমান আছে। এবং এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে বের করে নাও যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে অথবা আমাকে (যেকোনোভাবে) স্মরণ করেছে কিংবা কোনো অবস্থায় আমাকে ভয় করেছে। (হাকেম)

(মুসতাদরাকে হাকেম ১/৭০ ২৩৪, ২৩৫)
হাদীসটি সহীহ।

ক.

হযরত হোজায়ফা (রা.) যিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর গোপনীয় বিষয়ে অবগত ছিলেন। তিনি বলেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, এমন এক সময় আসবে, যখন ইসলাম এমন ম্লান হয়ে যাবে যেমন কাপড়ের কারুকার্য (পুরাতন হওয়ার কারণে) ম্লান হয়ে যায়। রোজা, হজ, যাকাত কী, লোকেরা তা জানবে না। অবশেষে এমন একটি রাত আসবে যে কোরআন পাক উঠিয়ে নেওয়া হবে, একটি আয়াতও বাকি থাববে না। বৃদ্ধ নারী-পুরুষেরা এরূপ বলবে যে আমরা আমাদের মুরব্বিদের কালেমা পড়তে শুনেছি কাজেই আমরাও তা পড়ব। হযরত হোজায়ফা (রা.)-এর এক শাগরেদ বলল, হুজুর! যখন যাকাত, হজ, রোজা কিছুই থাকবে না, তখন শুধু এই কালেমা কি কাজে আসবে? হযরত হোজায়ফা (রা.) চুপ করে রইলেন। তিনবার প্রশ্ন করার পর তিনি বললেন, (কোনো না কোনো সময়) জাহান্নাম হতে বের করবে, জাহান্নাম হতে বের করবে, জাহান্নাম হতে বের করবে। অর্থাৎ ইসলামের অন্যান্য হুকুম পালন না করার কারণে শাস্তি ভোগ করার পর কোনো না কোনো সময় কালেমার বরকতে জাহান্নাম হতে মুক্তি লাভ করবে।

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :يَدْرُسُ الْإِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبِ، حَتَّى لَا يُدْرَى مَا صِيَامٌ، وَلَا صَلَاةٌ، وَلَا نُسُكٌ، وَلَا صَدَقَةٌ، وَلَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ، فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ، وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ، يَقُولُونَ :أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَنَحْنُ نَقُولُهَا "فَقَالَ لَهُ صِلَةُ :مَا تُغْنِي عَنْهُمْ :لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَهُمْ لَا يَدْرُونَ مَا صَلَاةٌ، وَلَا صِيَامٌ، وَلَا نُسُكٌ، وَلَا صَدَقَةٌ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حُذَيْفَةُ، ثُمَّ رَدَّهَا عَلَيْهِ ثَلَاثًا، كُلَّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ حُذَيْفَةُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَالَ :يَا صِلَةُ، تُنْجِيهِمْ مِنَ النَّارِ ثَلَاثًا

(সুনানে ইবনে মাজাহ ২/২৯৩ হা. ৪০৪৯, মুসতাদরাকে হাকেম ৪/৫৪৫ হা. ৮৬৩৬)
হাদীসটি সহীহ।

খ.

এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়বে তা কোনো না কোনো দিন অবশ্যই তার কাজে আসবে, যদিও বা কিছু শাস্তি ভোগ করতে হয়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ قَالَ لا إله إلَّا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه.

(শু'আবুল ঈমান [বায়হাকী] ১১/১০৯ হা. ৯৭, মুসনাদে বাযযার [কাশফুল আসতার] ১/১০, মু'জামুল আওসাত ৬/৩৫১ হা. ৬৩৯৬, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১/১৭, মু'জামুস সাগীর ১/১৪০ হা. ৩৮৩)
হাদীসটি সহীহ।

হাদীস নং-৩১ :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ :أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيٌّ، عَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ طَيَالِسَةٍ، مَكْفُوفَةٌ بِدِيبَاجٍ، أَوْ مَزْرُورَةٌ بِدِيبَاجٍ، فَقَالَ :إِنَّ صَاحِبَكُمْ هَذَا يُرِيدُ أَنْ يَرْفَعَ كُلَّ رَاعٍ ابْنَ رَاعٍ، وَيَضَعَ كُلَّ فَارِسٍ ابْنِ فَارِسٍ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغْضَبًا، فَأَخَذَ بِمَجَامِعِ جُبَّتِهِ، فَاجْتَذَبَهُ، وَقَالَ " :لَا أَرَى عَلَيْكَ ثِيَابَ مَنْ لَا يَعْقِلُ "، ثُمَّ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَلَسَ، فَقَالَ ": إِنَّ نُوحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، دَعَا ابْنَيْهِ، فَقَالَ : إِنِّي قَاصِرٌ عَلَيْكُمَا الْوَصِيَّةَ، آمُرُكُمَا بِاثْنَتَيْنِ، وَأَنْهَاكُمَا عَنِ اثْنَتَيْنِ، أَنْهَاكُمَا عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ، وَآمُرُكُمَا بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِمَا لَوْ وُضِعَتْ فِي كَفَّةِ الْمِيزَانِ، وَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي الْكَفَّةِ الْأُخْرَى، كَانَتْ أَرْجَحَ، وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا حَلْقَةً، فَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِمَا، لَفَصَمَتْهَا، أَوْ لَقَصَمَتْهَا، وَآمُرُكُمَا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ،، وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ "

একজন গ্রাম্যলোক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খেদমতে এল। লোকটি রেশমি জুব্বা পরিহিত ছিল এবং তার কিনারায় রেশমের কারুকার্য করা ছিল। (সাহাবাদের প্রতি লক্ষ করে) বলতে লাগল, তোমাদের সাথী (মুহাম্মদ (সা.) প্রত্যেক বকরির রাখাল ও তাদের সন্তানদেরকে উন্নত এবং প্রত্যেক অশ্বারোহী ও

তাদের সন্তানদেরকে অবনত করতে চাচ্ছেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাগান্বিত হয়ে দাঁড়ালেন এবং তার কাপড়ের বুকের অংশ ধরে কিছুটা টানলেন আর বললেন যে (তুমিই বলো) তুমি কি বেকুবদের মতো কাপড় পরোনি? অতঃপর নিজের জায়গায় এসে বসলেন এবং বললেন যে হযরত নূহ (আ.) যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত তখন তাঁর পুত্রকে বললেন, আমি তোমাদেরকে (শেষ) অসিয়ত করছি। দুটি বিষয় হতে নিষেধ করছি আর দুটি বিষয়ের আদেশ করছি। যে দুটি বিষয় হতে নিষেধ করছি তন্মধ্যে একটি হলো শিরক আর দ্বিতীয়টি হলো অহংকার। আর যে দুটি বিষয়ের আদেশ করছি তার একটি হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। সমস্ত আসমান-জমিন এবং যা কিছু এর মধ্যে আছে সব কিছু যদি এক পাল্লায় রাখা হয় এবং অপর পাল্লায় (এখলাসের সহিত বলা) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ রাখা হয়, তবে উক্ত পাল্লাই ঝুঁকে যাবে। আর যদি সমস্ত আসমান-জমিন এবং যা কিছু এর মধ্যে আছে একটি হালকা বা গোলাকার করে এর ওপর এই পবিত্র কালেমাকে রাখা হয় তবে তা ওজনের কারণে ভেঙে যাবে। দ্বিতীয় বিষয় যার আদেশ করছি তা হলো, 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' এই দুটি শব্দ প্রত্যেক মখলূকের তাসবীহ এবং তার বরকতে প্রত্যেক জিনিসকে রিযিক দান করা হয়। (আহমদ, হাকেম)

(মুসতাদরাকে হাকেম ১/৪৯০৪৮ হা. ১৫৩, মুসনাদে আহমদ ২/২২৫ হা. ৭১২০, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ২/২৬৭ হা. ২২৭১, আমালুল ইয়াউমা ওয়াল লাইলাহ [নাসাঈ] ২৪৬, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/৮৪ হা. ১৬৮১) হাদীসটি সহীহ।

ক.

حَدَّثَنِى شَيْخٌ مِنْ قُرَيْشٍ، عَنِ ابْنِ حَكِيمٍ، قَالَ :قَالَ لِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ :قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :يَا ابْنَ الْخَطَّابِ قُلِ :اللَّهُمَّ اجْعَلْ سَرِيرَتِى خَيْرًا مِنْ عَلاَنِيَتِى، وَاجْعَلْ عَلاَنِيَتِى صَالِحَةً

(তিরমিযী শরীফ ২/১৯৯ হা. ৩৫৮৬, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১০/৪২৭ হা. ২৯৮২৪, হিলয়াতুল আওলিয়া ১/৫৩, কিতাবুদ দু'আ [তাবরানী] হা. ১৪৩১, জামেউস সগীর হা. ৮৫২৭)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে যাবে আল-আবরার

নিউ রূপসী কার্পেট

সকল ধরনের কার্পেট বিক্রয় ও
সরবরাহের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

স্বত্বাধিকারী : হাজী সাইদুল কবীর

৭৩/এ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।
ফোন : ৮৬২৮৮৩৪, ৯৬৭২৩২১

বি.দ্র. মসজিদ-মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে।

দরসে ফিক্বহ

পোশাক-পরিচ্ছদ : আহকাম ও মাসায়েল-৪

মুফতী শাহেদ রহমানী

পোশাকের দৈর্ঘ্য নির্ধারণে শরীয়তের সীমারেখা

সব বস্তুগত বিষয় দৈর্ঘ্য-প্রস্থের আলোকে পরিমাপ করা যায়। পোশাকেরও রয়েছে দৈর্ঘ্য-প্রস্থ। রয়েছে এর শরয়ী নীতিমালা। ইসলামসম্মত পোশাকের প্রস্থের পরিমাপ কী? এক কথায় বলা যায়, পোশাক ঢিলেঢালা হতে হবে আঁটসাঁট, সংকীর্ণ ও অঙ্গপ্রদর্শক হতে পারবে না। আর ইসলামসম্মত পোশাকের দৈর্ঘ্য হলো, তা টাখনুর নিচে পরিধান করা যাবে না। পুরুষের পোশাক যখন টাখনু বা পায়ের গোড়ালির হাড় অতিক্রম করে, শরীয়তের পরিভাষায় এটাকে 'ইসবাল' বলা হয়। অসংখ্য হাদীসে এর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। আমাদের মুসলিম সমাজে পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটায় অনেক মুসলমানকেও এমন নিষিদ্ধ কাজ করতে দেখা যায়। অথচ খাঁটি মুসলমান হওয়ার জন্য মহানবী (সা.)-এর পরিপূর্ণ অনুসরণ করা অপরিহার্য।

টাখনুর কতটুকু ওপরে পোশাক পরিধান করতে হবে?

পুরুষের পোশাকের দৈর্ঘ্যের ব্যাপারে এটা তো স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে গোড়ালির ওপরের হাড়ের নিচে কোনো পোশাক পরিধান করা যাবে না। প্রশ্ন হলো, গোড়ালির কতটুকু ওপরে পোশাক পরিধান করতে হবে? স্মরণ রাখতে হবে, এখানে শরীয়তের তিনটি বিধান রয়েছে। এক. গোড়ালির হাড়ের নিচে পোশাক পরিধান করা মাকরূহে তাহরীমী। দুই. গোড়ালির হাড়ের ওপরে (হাঁটুর নিচে) যেকোনো স্থানে পোশাক পরিধান করা বৈধ হলেও নিসফ সাকের উপরে পরিধান করা উত্তম নয়। তিন. নিসফে সাক বা পায়ের গোছার মধ্যভাগ পর্যন্ত পোশাক পরিধান করা মুস্তাহাব। (বজলুল মাজহুদ : ১৬/৪১১; আওজাযুল মাসালিক : ১৬/১৯১)

হাদীস শরীফে এসেছে :

عن حذيفة قال: اخذ رسول الله ﷺ بعضلة ساقى او ساقيه، فقال: هذا موضع الازار فان ابيت فاسفل فان ابيت فلا حق لازار فى الكعبين (ترمذى ١٧٨٣)

হযরত হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার অথবা নিজের পায়ের গোছার শক্ত অংশ ধরে বললেন, 'এটা লুঙ্গি পরিধানের স্থান। যদি এটা না হয়, তাহলে এর কিছু নিচে। যদি সেটাও সম্ভব না হয়, তবে গোড়ালির হাড়ের নিচে লুঙ্গি পরিধানের অধিকার নেই।' (তিরমিযী শরীফ : ১৭৮৩)

সাহাবায়ে কেরামের পোশাক গোড়ালির কতটুকু ওপরে হতো, এ বিষয়ে আল্লামা ইবনে সিরীন (রহ.) বলেন :

كانوا يكرهون الازار فوق نصف الساق (ابن ابى شيبه ٢٤٨٢٨)

অর্থাৎ তাঁরা পায়ের গোছার মধ্যভাগের ওপরে পোশাক পরিধান করা অপছন্দ করতেন। এখানে আরো একটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে যে টাখনুর নিচে পোশাক পরিধান নিষিদ্ধ হওয়ার বিধান কেবল লুঙ্গি, পায়জামা ও প্যান্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং যেকোনো পোশাকের জন্য এ বিধান প্রযোজ্য। তাই সালোয়ার, লুঙ্গি, পায়জামা, প্যান্ট, জামা, জুব্বা, পাগড়ি, চাদর ইত্যাদি টাখনুর নিচে পরিধান করা কবীরা গোনাহ। (ফতহুল বারী : ১০/২৬২, বজলুল মাজহুদ : ১৬/৪১১) এ বিষয়ে হাদীস শরীফেও স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন :

من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله اليه يوم القيامة فقلت لمحارب : اذكر ازاره ؟ قال ما خص ازارا ولا قميصا (بخارى ٥٧٩١)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি অহংকার করে নিজের পোশাক টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে রাখে, আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন তার দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ বিধানের ক্ষেত্রে কেবল লুঙ্গিকে সীমাবদ্ধ করেননি। তাই এ ক্ষেত্রে লুঙ্গি, জামা–সব কিছুর বিধান বরাবর। (বুখারী শরীফ হা. ৫৭৯১) অন্য হাদীসে বিষয়টি আরো স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে :

عن عبد الله بن عمر عن النبى ﷺ قال: الاسبال فى الازار والقميص والعمامة (ابوداود ٤٠٩٤)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'ইসবাল বা টাখনুর নিচে পোশাক পরিধান নিষিদ্ধ হওয়ার বিধান লুঙ্গি, জামা ও পাগড়ির ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য।' (আবু দাউদ : হা. ৪০৯৪)

সর্বাবস্থায় টাখনুর নিচে পোশাক পরিধান নিষিদ্ধ

অনেকে এই ভুল ধারণার শিকার যে টাখনুর নিচে পোশাক পরিধান

অহংকারবশত হলে গোনাহ। অন্যথায় গোনাহ নয়! এ বিষয়ে কিছু আধুনিক মনমানসিকতার অধিকারী ব্যক্তি বিভ্রান্তির শিকার। কিছু হাদীসের দু-একটি শব্দের বাহ্যিক অর্থের দিকে তাকিয়ে তারা এমন ধারণা পোষণ করে থাকে। প্রথমত, তাদের যুক্তি হলো, যেসব হাদীসে টাখনুর নিচে পোশাক পরিধান নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সেগুলোতে খুয়ালা বা অহংকারের মানসিকতা ছাড়া টাখনুর নিচে পোশাক পরিধান করলে তা গোনাহ হবে না বোঝা যায়। দ্বিতীয়ত, হযরত আবু বকর (রা.)-এর একটি কথা থেকে তাদের কাছে এ বিষয়ে সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয়। তিনি বলেছেন, 'আমার লুঙ্গির এক পাশ ঝুলে যায়। ফলে আমি সতর্ক থাকি, যেন তা টাখনুর নিচে চলে না যায়।' এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন :

لست ممن يفعله خيلاء (ابوداود ٤٠٨٥)

অর্থাৎ হে আবু বকর তুমি তো তাদের মতো নও, যারা অহংকার করে এমনটা করে। (আবু দাউদ : ৪০৮৫)

সুতরাং তাদের দাবি হলো, এই হাদীসে অহংকারের শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে আবু বকর (রা.)-কে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের মতে, অহংকারের মানসিকতা থাকুক বা না-থাকুক, সর্বাবস্থায় টাখনুর নিচে পোশাক পরিধান করা নিষেধ। এর সপক্ষে বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনাও পাওয়া যায়। প্রথমত, যেসব হাদীসে খুয়ালা বা অহংকারবশত শর্ত যোগ করা হয়েছে, এর বাইরেও এমন অসংখ্য হাদীস পাওয়া যায়, যেগুলোতে টাখনুর নিচে পোশাক পরিধান নিষিদ্ধের বিবরণ পাওয়া যায়, কিন্তু সেখানে অহংকারের শর্ত যুক্ত করা হয়েছে, এগুলোর সঙ্গে মূল হুকুমের সম্পর্ক নেই, বরং সাধারণ রীতি ও অধিকাংশ মানুষের ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে তা উল্লেখ করা হয়েছে। ফাতওয়ায়ে রহীমীয়াতে উল্লেখ রয়েছে :

خیلاء قید احترازی نہیں بلکہ قید اتفاقی ہے (فتاوی رحیمیہ:۵/۱۴۸)

দ্বিতীয়ত, টাখনুর নিচে পোশাক পরিধান নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন :

ارفع ازارك فانه ابقى وانقى (مسند احمد : ٢٣٠٨٦)

অর্থাৎ তুমি তোমার লুঙ্গি ওপরে তুলে নাও। কেননা এতে কাপড় স্থায়ী ও পরিচ্ছন্ন থাকে। (মুসনাদে আহমদ : ২৩০৮৬) তাই অহংকারের কারণে নয়; নাপাকি, অপবিত্রতা ও অপরিচ্ছন্নতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য টাখনুর নিচে পোশাক পরিধান নিষিদ্ধ করা হয়েছে (ফতহুল বারী : ১০/২৬৩, তাকমেলায়ে ফতহুল মুলহিম : ৪/১০৬)

তৃতীয়ত, রাসূলুল্লাহ (সা.) পোশাকে নারীদের সাদৃশ্য গ্রহণকারী পুরুষদের অভিশাপ দিয়েছেন। আর পুরুষরা টাখনুর নিচে পোশাক পরিধান করলে নারীদের সাদৃশ্য হয়ে যায়। কেননা ইসলামী শরীয়তে নারীদের জন্য টাখনুর নিচে পোশাক পরিধানের অনুমতি রয়েছে। সুতরাং নারীদের সাদৃশ্য বর্জনের লক্ষ্যে যেকোনো ধরনের পোশাক, যেকোনো অবস্থায় পুরুষদের জন্য টাখনুর নিচে পরিধান নিষিদ্ধ করার বিকল্প নেই।

চতুর্থত, অন্য একটি হাদীসে এ বিষয়ে আরো স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন :

يا ابن عمر، كل شئ مس الارض من الثياب ففى النار (مسند احمد ٥٧٢٧)

অর্থ : হে ইবনে উমর! কাপড়ের যে অংশ জমিনকে স্পর্শ করবে, শরীরের ততটুকু অংশ জাহান্নামে জ্বলবে। (মুসনাদে আহমদ : ৫৭২৭)

হযরত আবু বকর (রা.) এবং টাখনুর নিচে কাপড় পড়ার বিধান

কখনো কখনো হযরত আবু বকর (রা.) থেকে টাখনুর নিচে কাপড় পরিধানের প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত কাজের দরুন টাখনুর নিচে কাপড় পরিধানকে বৈধ বলার সুযোগ নেই। হাদীসবিদরা এই ঘটনার বিভিন্ন ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন।

এক. আবু বকর (রা.) দৈহিকভাবে দুর্বল ছিলেন। এই দুর্বলতার কারণেই কখনো কখনো টাখনুর নিচে তাঁর কাপড় চলে যেত। (ফতহুল বারী : ১০/২৫৫)

দুই. হযরত আবু বকর (রা.) ইচ্ছাকৃত এমনটা করতেন না, বরং অসর্তকতাবশত, অনিচ্ছাকৃত কখনো কখনো তাঁর কাপড় টাখনুর নিচে পড়ে যেত। (ফতহুল বারী : ১০/২৫৫)

তিন. আবু বকর (রা.) কর্তৃক এমন ঘটনা মাঝেমধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। এর ওপর তাঁর ধারাবাহিক ও স্বতন্ত্র আমল ছিল না। (ফতহুল বারী : ১০/২৫৫)

চার. বর্ণিত আছে, আবু বকর (রা.) যখনই অনুভব করতেন যে তাঁর পোশাক টাখনুর নিচে চলে গেছে, তখনই তিনি তা ওপরে উঠিয়ে নিতেন। (ফতহুল বারী : ১০/২৫৫)

পাঁচ. মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মুখে এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল যে আবু বকর (রা.)-এর মধ্যে অহংকার নেই। তাই তাঁর ব্যাপারটি অন্যদের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। (বুখারী শরীফ হা. ৩৬৬৫) উল্লিখিত শর্তগুলোর প্রতি আজকাল কোথাও দৃষ্টিপাত করা হয় না। সুতরাং হযরত আবু বকর (রা.)-এর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে টাখনুর নিচে পোশাক পরিধানকে বৈধ বলার সুযোগ নেই।

টাখনুর নিচে পোশাক পরিধানের শাস্তি

মানুষকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে ইবাদতের জন্য, আল্লাহর আনুগত্যের জন্য। সেই আনুগত্যের পরীক্ষাকেন্দ্র হলো দুনিয়া। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার পরীক্ষাকেন্দ্রে যারা উত্তীর্ণ হবে, চিরস্থায়ী জীবনে তাদের জন্য রয়েছে অকল্পনীয় নিয়ামতরাজি। রয়েছে সুখময় জীবনের সামগ্রিক বন্দোবস্ত। পক্ষান্তরে যারা এই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবে, পরকালে

তারা কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হবে। অনন্তকাল চির অপমান ও লাঞ্ছনার গ্লানি বয়ে বেড়াবে। আর অনেক অপরাধ এমন আছে, যেগুলোর শাস্তি দুনিয়ায়ও দেওয়া হয়, যাতে অপরাধীরা সতর্ক হতে পারে, নিজেদের শুধরে নিতে পারে। টাখনুর নিচে পোশাক পরিধান করলে পরকালে কঠিন শাস্তির হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। সতর্কবার্তা হিসেবে দুনিয়াতেই এই অপরাধের শাস্তি দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে পবিত্র হাদীস শরীফে।

টাখনুর নিচে পোশাক পরিধানে পরকালের শাস্তি

মহানবী (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি অহংকারবশত নিজের পোশাক (টাখনুর নিচে) ঝুলিয়ে রাখে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না।' (বুখারী শরীফ : ৫৭৮৮, তিরমিযী : হা. ১৭৩০, আবু দাউদ : হা. ৪০৮৫) টাখনুর নিচে পোশাক পরিধানকারী পরকালে বেদনাদায়ক শাস্তির সম্মুখীন হবে। সেই শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়া তাদের জন্য খুবই দুরূহ হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন :

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قُلْتُ :مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا؟ فَأَعَادَهَا ثَلَاثًا، قُلْتُ :مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ خَابُوا وَخَسِرُوا؟ فَقَالَ : الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ (ابوداود ٤٠٨٧).

অর্থ : তিন ধরনের লোক এমন আছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। তাদের দিকে তাকাবেন না। গোনাহ থেকে পবিত্র করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। বর্ণনাকারী জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেসব লোক কারা, তারাতো চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, অপদস্থ হয়েছে? মহানবী (সা.) আগের কথাগুলো তিনবার পুনরাবৃত্তি করেন। বর্ণনাকারী পুনরায় একই প্রশ্ন করার পর মহানবী (সা.) ইরশাদ করেন, ওই তিন ব্যক্তি হলো–এক. টাখনুর নিচে পোশাক পরিধানকারী। দুই. উপকার করে খোঁটা দানকারী। তিন. ওই ব্যবসায়ী, যে মিথ্যা শপথ করে নিজ পণ্য বিক্রয় করে। (আবু দাউদ : হা. ৪০৮৭) অন্য হাদীসে এসেছে :

يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، اتَّقُوا اللّٰهَ، وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ ثَوَابٍ أَسْرَعَ مِنْ صِلَةِ رَحِمٍ، وَإِيَّاكُمْ وَالْبَغْيَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عُقُوبَةٍ أَسْرَعَ مِنْ عُقُوبَةِ بَغْيٍ، وَإِيَّاكُمْ وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ، فَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَلْفِ عَامٍ، وَاللّٰهِ لَا يَجِدُهَا عَاقٌّ، وَلَا قَاطِعُ رَحِمٍ، وَلَا شَيْخٌ زَانٍ، وَلَا جَارٌّ إِزَارَهُ خُيَلَاءَ، إِنَّمَا الْكِبْرِيَاءُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (طبرانى اوسط ٥٦٦٤)

নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, 'হে মুসলিম সমাজ! আল্লাহকে ভয় করো। আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখো। কেননা আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখার চেয়ে অতি দ্রুত কোনো কিছুর সাওয়াব পাওয়া যায় না। আর তোমরা অন্যায়-অবিচার থেকে বেঁচে থেকো। কেননা অবিচারের চেয়ে দ্রুত কোনো জিনিসের শাস্তি দেওয়া হয় না। এরই সঙ্গে পিতা-মাতার অবাধ্যতার ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। কেননা জান্নাতের সুঘ্রাণ হাজার বছরের দূরত্ব ও ব্যবধানে বিদ্যমান। অথচ আল্লাহর শপথ করে বলছি, পিতা-মাতার অবাধ্যরা সেই সুঘ্রাণ পাবে না। আত্মীয়তা ছিন্নকারী সেই মধুর ঘ্রাণ পাবে না। বৃদ্ধ ব্যভিচারী সেই বিমুগ্ধ বাতাস পাবে না। অহংকারবশত টাখনুর নিচে বস্ত্র পরিহিত ব্যক্তি সেই মনমাতানো ঘ্রাণ পাবে না। অহংকার তো বিশ্ব পালনকর্তাকেই মানায়। (তাবারানী আওসাত : হা. ৫৬৬৪) উল্লিখিত হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, টাখনুর নিচে পোশাক পরিধানকারী জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। এখান থেকে এই বিষয়টি খুব সহজেই অনুমেয় যে জান্নাতে যার ঠাঁই হবে না, জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। এ বিষয়ে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ হাদীস হলো :

ما اسفل من الكعبين من الازار ففى النار (بخارى ٥٧٨٧)

অর্থাৎ পোশাকের যে অংশ টাখনুর নিচে থাকবে, পায়ের ততটুকু অংশ জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। (বুখারী শরীফ : হা. ৫৭৮৭)

টাখনুর নিচে পোশাক পরিধানে ইহকালীন ক্ষতি

মুমিন-মুত্তাকীদের আল্লাহ ভালোবাসেন, এ কথা কোরআন ও হাদীসের অসংখ্য স্থানে বিবৃত হয়েছে। কিন্তু টাখনুর নিচে পোশাক পরিধানকারী ঈমানদার হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত থাকে। মহানবী (সা.) ইরশাদ করেছেন :

ارفع ازارك فان الله لا يحب المسبلين (شعب الايمان ٥٧٢٠)

অর্থ : তুমি তোমার পোশাক টাখনুর ওপরে উঠিয়ে নাও। কেননা আল্লাহ তা'আলা টাখনুর নিচে পোশাক পরিধানকারীদের পছন্দ করেন না। (শু'আবুল ঈমান : হা. ৫৭২০) এমন ব্যক্তি নামাজ আদায় করলেও আল্লাহ তা'আলা তার নামাজ কবুল করেন না। হাদীস শরীফে এসেছে :

ان الله لا يقبل صلاة رجل مسبل (ابو داود ٤٠٨٦)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা টাখনুর নিচে পোশাক পরিধানকারীর নামাজ কবুল করেন না। (আবু দাউদ : হা. ৪০৮৬) অন্য হাদীসে এসেছে :

من مس ازاره كعبيه ، لم يقبل له صلاة (ابن ابى شيبه ٢٤٨١٤)

অর্থাৎ যার লুঙ্গি (যেকোনো পোশাক) তার টাখনুদ্বয়কে স্পর্শ করে, তার নামাজ কবুল হয় না। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : হা. ২৪৮১৪) উল্লিখিত হাদীসগুলো থেকে জানা যায়, টাখনুর

নিচে পোশাক পরিধান এমন পাপ, যার ফলে সে তার পুণ্যের কাজ যেমন নামায থেকেও সাওয়াব পাওয়ার আশা করতে পারে না।

অপরাধ মানুষই করে। সেই অপরাধ ক্ষমা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন পন্থা ও ব্যবস্থা রেখেছেন। কখনো কখনো বান্দার অপরাধ ক্ষমা করার জন্য তিনি তাঁর রহমত ও মাগফিরাতের দরজা অবারিত, উন্মুক্ত করে দেন। এমনি এক মাহেন্দ্রক্ষণ হলো শবে বরাত। এমন দিনেও টাখনুর নিচে পোশাক পরিধানকারী আল্লাহর অবারিত ক্ষমা থেকে বঞ্চিত থাকে। ইরশাদ হয়েছে :

أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ :هَذِهِ اللَّيْلَةُ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَلِلَّهِ فِيهَا عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ بِعَدَدِ شُعُورِ غَنَمِ كَلْبٍ، لَا يَنْظُرُ اللهُ فِيهَا إِلَى مُشْرِكٍ، وَلَا إِلَى مُشَاحِنٍ، وَلَا إِلَى قَاطِعِ رَحِمٍ، وَلَا إِلَى مُسْبِلٍ، وَلَا إِلَى عَاقٍّ لِوَالِدَيْهِ، وَلَا إِلَى مُدْمِنِ خَمْرٍ (شعب الايمان ٣٦٢/٥)

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, এক রাতে হযরত জিব্রাঈল (আ.) আমার কাছে এসে বলেন : এটি মধ্য শা'বানের রাত বা শবে বরাত। এই রাতে আল্লাহ তা'আলা বনু কালব গোত্রের বকরির পশমের চেয়েও বেশিসংখ্যক মানুষকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেন। কিন্তু এই রাতেও তিনি কয়েক ধরনের লোকদের ক্ষমা করেন না। তাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকান না। তারা হলো মুশরিক, দুমুখী, আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্নকারী, টাখনুর নিচে পোশাক পরিধানকারী, পিতা-মাতার অবাধ্য ও মদ্যপ। (শু'আবুল ঈমান : ৩৬২/৫) ওপরের আলোচনা থেকে এ বিষয়টি পরিষ্কার যে টাখনুর নিচে পোশাক পরিধান করা গর্হিত অপরাধ। আর এটাও স্পষ্ট যে আল্লাহর অগণিত নিয়ামত ভোগ করে অব্যাহত অপরাধ করে কোনো ব্যক্তি নিরাপদ থাকতে পারে না। যেকোনো সময়ই এমন অপরাধী আসমানী আজাবের সম্মুখীন হতে পারে। হাদীস শরীফে এসেছে :

بينما رجل يجر ازاره اذخسف به، فهو يتجلل في الارض الى يوم القيامة (بخاری ٥٧٨٨، فتح الباری ٢٦١/١٥)

অর্থাৎ এক ব্যক্তি টাখনুর নিচে পোশাক পরিধান করে চলতে ছিল, হঠাৎ সে মাটির নিচে দেবে যায়। কেয়ামত অবধি সে মাটির নিচে দাবতেই থাকবে। (বুখারী শরীফ : হা. ৫৭৮৮, ফতহুল বারী : ২৬১/১০)

টাখনুর ওপরে পোশাক পরিধানের উপকারিতা

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের পাশাপাশি টাখনুর ওপরে পোশাক পরিধানে বহুবিধ উপকারিতা রয়েছে। প্রথমত, এটি ব্যক্তির বিনয় ও ধর্মপ্রবণতা প্রকাশ করে। দ্বিতীয়ত, এটি আদর্শ ব্যক্তিত্বের পরিচয় বহন করে। হাদীস শরীফে এসেছে :

نعم الفتى سمرة، لو اخذ من لمته وشمر من مئزره ففعل ذلك سمرة، اخذ من لمته وشمر من مئزره (مسند احمد ١٧٧٨٨)

অর্থাৎ সামুরা কত ভালো মানুষ, যদি সে নিজের চুল কেটে নিত এবং পোশাক টাখনুর ওপরে রাখত! এটা শুনে হযরত সামুরা (রা.) ত্বরিত এর ওপর আমল করেন। তিনি নিজের চুল ছোট করেন এবং পোশাক টাখনুর ওপরে তুলে নেন। (মুসনাদে আহমদ : হা. ১৭৭৮৮) এই হাদীস থেকে জানা যায়, চুল ছোট রাখা, টাখনুর নিচে পোশাক পরিধান করা আদর্শ ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক।

তৃতীয়ত, টাখনুর ওপরে পোশাক পরিধান করার কারণে কাপড় টেকসই (লং লাস্টিং) হয়।

চতুর্থত, টাখনুর ওপরে পোশাক পরিধান করলে পোশাক পরিচ্ছন্ন থাকে। অপবিত্রতা থেকে বাঁচা যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন :

اما لو رفعت ثوبك كان ابقى واتقى (مسند احمد ٢٣٠١٨٧)

হযরত উবায়দা বিন খালফ (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ বলেন, তুমি যদি তোমার কাপড় উঠিয়ে নিতে, তাহলে তা অধিক স্থিতিশীল ও পরিচ্ছন্ন থাকত। (মুসনাদে আহমদ : ২৩০৮৭)

পঞ্চমত, টাখনুর ওপরে পোশাক পরিধান করা তাকওয়া বা খোদাভীতি অর্জনের মাধ্যম। হাদীস শরীফে এসেছে :

ارفع ازارك واتق الله (طبرانی کبیر ٧٢٤١)

অর্থাৎ তোমার পোশাক ওপরে তুলে নাও এবং তাকওয়া অর্জন করো। (তাবরানী কাবীর : ৭২৪১) সর্বোপরি সব যুগের সব দেশের নেককার, পরহেজগার ও খোদাভীরু বান্দারা টাখনুর ওপরে পোশাক পরিধান করেন। তাই পরিপূর্ণ ঈমানদার কিছুতেই টাখনুর নিচে পোশাক পরিধান করতে পারে না। অনেকেই এ ক্ষেত্রে পরিবেশগত কারণকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করান। স্মরণ রাখতে হবে, পরিবেশ এমনিতেই গড়ে ওঠে না, পরিবেশকে গড়ে তুলতে হয়। ঈমানের চেতনা ও অদম্য প্রেরণা যদি থাকে তাহলে আমল করার জন্য পরিবেশ বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় না।

পোশাকে অনর্থক অপচয় নিষিদ্ধ

অপচয় শব্দটিকে আরবীতে 'ইসরাফ' বলা হয়। এর অর্থ সীমা লঙ্ঘন। এর বিভিন্ন সংজ্ঞা রয়েছে। অপচয় শব্দের সঙ্গে অর্থ-বিত্তের একটা সুতীক্ষ্ণ সম্পর্ক অনেকে স্থির করে নিয়েছে। ইমাম কুরতুবী (রহ.) লিখেছেন :

الاسراف الافراط في الشی ومجاوزة الحد(تفسير قرطبی ٢٣١/٤)

অর্থাৎ কোনো কিছুতে সীমা লঙ্ঘন ও ভারসাম্যপূর্ণ সীমা অতিক্রম করাকে 'ইসরাফ' বলা হয়। (তাফসিরে কুরতুবী : ৪/২৩১) আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী (রহ.) লিখেছেন :

الاسراف مجاوزة الحدفی کل فعل او

قول وهو فى الانفاق اشهر (فتح البارى ١٠/٢٥٣)

অর্থাৎ প্রতিটি কথা ও কাজে নির্ধারিত চৌহদ্দি অতিক্রম করাকে 'ইসরাফ' বলা হয়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সীমা অতিক্রম বোঝাতে ইসরাফ শব্দটির ব্যবহার অধিক প্রসিদ্ধ। (ফতহুল বারী : ১০/২৫৩) তাহলে আমরা দেখতে পাই, যেকোনো বিষয়েই অপচয় হতে পারে। সীমা অতিক্রম হতে পারে। ইসলামী শরীয়ত মতে, পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে অনর্থক অপচয়, অপব্যয় ও সীমা লঙ্ঘন নিষিদ্ধ।

অপচয় বা সীমা অতিক্রমের বিভিন্ন পর্যায়

অপচয় বা সীমা অতিক্রমের বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। এক. অপাত্রে খরচ করা। দুই. আল্লাহর অবাধ্যতায় অর্থব্যয় করা। তিন. বৈধ কাজে প্রয়োজন ও ভারসাম্যপূর্ণ সীমারেখা অতিক্রম করা। চার. হালালের সীমা ছেড়ে হারামকে গ্রহণ করা অথবা হারামকে হালাল করে নেওয়া। (মা'আরেফুল কোরআন : ৩/৫০৪)

অপচয় কেবল অর্থ ব্যয়ের সঙ্গেই সম্পৃক্ত নয়

অনেকে এ বিষয়ে বিভ্রান্তির শিকার যে, তারা মনে করে, অপচয় বলা হয় অপব্যয়কে। অথচ কোরআন ও হাদীসের আলোকে জানা যায়, জীবনের সব শাখা-প্রশাখায় ন্যায্যপথ ও ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা অতিক্রম করাকে ইসরাফ বা অপচয় বলা হয়।

খাবারে অপচয় : খাবারের ক্ষেত্রে অপচয় হলো, ক্ষুধা ও প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খাওয়া। হালালের সীমা অতিক্রম করে হারাম খাবার গ্রহণ করা। সব সময় খাবারের ধান্দায় থাকা। (মা'আরেফুল কোরআন : ৩/৫৪৬)

পোশাকে অপচয় : প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিধান করা, মাত্রাতিরিক্ত সাজসজ্জা গ্রহণ করা পোশাকের 'ইসরাফ'। যদিও ব্যাপকভাবে অর্থাৎ সীমা লঙ্ঘন অর্থে বিবস্ত্র থাকা, পাপাচারীদের পোশাক পরিধান করা, নারী পুরুষের পোশাক এবং পুরুষ নারীর পোশাক পরিধান করা 'ইসরাফ'-এর অন্তর্ভুক্ত।

সময়ের অপচয় : সময়ের অপচয় হলো, আল্লাহর অবাধ্যতায় অনর্থক কাজে সময় নষ্ট করা। সফল মুমিনের বিষয়ে আল্লাহ বলেন :

الـذيـن هـم عن اللغو معرضون (مومنون ٣)

অর্থাৎ সফল মুমিন অসার ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত থাকে। (সূরা : মু'মিনুন, আয়াত : ৩)

পানি খরচে অপচয় : প্রয়োজনের চেয়ে বেশি পানি প্রবাহিত করা, ব্যবহার করা হাদীসের ভাষ্য মতে ইসরাফ তথা অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত। একবার হযরত সা'দ (রা.) অজু করছিলেন। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন। হঠাৎ তিনি বলেন :

ماهذا السرف ؟

এই অপচয়ের কী অর্থ? সা'দ (রা.) বলেন : افى الوضوء اسراف

অজুতেও কী অপচয় হয়? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, হ্যাঁ, অজুর মধ্যেও অপচয় হয়, যদিও তুমি প্রবহমান নদীতে অজু করো। (ইবনে মাজা : হা. ৪২৫)

অর্থ ব্যয়ে অপচয় : অবৈধ কাজে অর্থ ব্যয় অথবা বৈধ কাজে প্রয়োজন অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনের বক্তব্য হলো :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا

অর্থ : তারা (রহমানের বান্দারা) যখন ব্যয় করে, তখন অপব্যয় করে না, কৃপণতাও করে না, বরং তারা এর মাঝে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে। (সূরা : ফুরকান, আয়াত : ৬৭)

বদলা বা প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষেত্রে অপচয় :

ইসলাম উদারতা, মহানুভবতা ও ক্ষমাশীলতাকে পছন্দ করে। তবে অন্যায়, জুলুম ও অবিচারকে মোটেও প্রশ্রয় দেয় না। তাই কেউ কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে ইসলাম এ ক্ষেত্রে কিসাস বা মৃত্যুদণ্ডের বিধান প্রবর্তন করেছে। তবে এই বদলা নেওয়ার ক্ষেত্রেও ইসলাম ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দিয়েছে। সীমা লঙ্ঘন করতে নিষেধ করেছে। ইরশাদ হয়েছে :

فلا يسرف فى القتل (بنى اسرائيل ٣٣)

অর্থ : হত্যার বদলে হত্যা করার ক্ষেত্রেও তোমরা সীমা লঙ্ঘন করো না। (সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত : ৩৩) অন্যদিকে কারো কাছ থেকে বদলা বা প্রতিশোধ সম্পর্কে নীতি কী হবে, কোরআন বলছে :

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

অর্থ : যদি তোমরা শাস্তি দিতে চাও, তবে ঠিক ততখানি শাস্তি দাও, যতখানি অন্যায় তোমাদের ওপর করা হয়েছে, (সূরা নাহল, আয়াত : ১২৬)

কথার মধ্যে অপচয় : সাধারণ অর্থে প্রয়োজন অতিরিক্ত কথা বলা কথার অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত। তবে ব্যাপক অর্থে মিথ্যা বলা, গীবত করা, গালি দেওয়া, অন্যকে কষ্টদায়ক কথা বলা কথার অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত।

কাজের মধ্যে অপচয় : অনর্থক কাজ করা, পাপ কাজ করা কথার অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বলেন :

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا.

আগের স্থিরচিত্তের অধিকারী নবীরা এই দু'আ করেছিলেন, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পাপ ও আমাদের কর্মে সীমা লঙ্ঘন তুমি ক্ষমা করো।' (সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৪৭)

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক্ব হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর

অমূল্য বাণী

প্রত্যেক অঙ্গের ব্যবহার শরয়ী মাসায়েল অনুযায়ী হওয়া জরুরি :

তালিবে ইলম ভাইয়েরা! সব সময় মনে রেখো, কিতাব যখন কাগজে ছেপে এসেছে সেখান থেকে তোমরা ব্রেইনে প্রিন্ট করে রাখো। কিন্তু মূল বিষয় হলো, কিতাবের এই মাসায়েলগুলো তোমাদের প্রত্যেক অঙ্গে প্রিন্ট হয়ে প্রকাশ হতে হবে। অর্থাৎ কিতাবে যে অঙ্গ-সংক্রান্ত মাসআলা ছাপা হয়েছে সে মাসআলাগুলো উক্ত অঙ্গে প্রকাশ পেতে হবে। যেমন–চোখসংক্রান্ত যেসব মাসআলা তোমরা কিতাবে পড়ছ সে মাসআলাগুলোর ব্যবহার তোমাদের চোখে প্রকাশ পেতে হবে। মুখসংক্রান্ত মাসআলাগুলো তোমাদের মুখে প্রকাশ পেতে হবে। তেমনি প্রতিটি অঙ্গসংক্রান্ত মাসআলাগুলো সে অঙ্গ থেকে প্রকাশ পেতে হবে–এটিই মূল বিষয়।

কোরআন মজীদের ব্যাপারে কমতি অনুধাবন না হওয়ার কারণ :

আমাদের স্বভাব-প্রকৃতি প্রত্যেক বিষয়ের কমতি অনুধাবন করে। আহার-বিহার বাসস্থান–সব ক্ষেত্রে যে বিষয়টির কমতি রয়েছে সেটা খুব তাড়াতাড়ি অনুমান করতে পারে। মতবখের খানায় লবণ-মরিচ কম হলে সেটা আমরা খুব তাড়াতাড়ি বলে দিতে পারি। আজ তরকারির সাধ কম হয়েছে তাও অনুধাবন করতে খুব একটা বেগ পেতে হয় না। কিন্তু পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের সময় কোন জায়গায় এখফা, এজহার এবং মাখরাজে কমতি হয়েছে সেটা তা অনুমান ও অনুধাবন করতে পারি না। এর কারণ হলো ইলমের কমতি এবং অন্তরে এর গুরুত্ব না থাকা।

আমরা আরবী পাঠদান করেছি কোরআন পড়াইনি :

একজন হাফেজে কোরআন আমাদের এখানে এসেছেন। বয়সও প্রায় ৪৮-৫০ হবে। কয়েক দিন ছিলেন। খুব ভালো কোরআন তেলাওয়াত করতেন। কিছুদিন পর আমাকে বললেন, সেখানকার সদরুল মুদাররিসীন আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। মনে মনে কিছু উদ্বেগ কাজ করছে। তার পরও ভাবলাম কিছুদিন এখানে থাকি। কিছু নিয়মনীতি ও কায়দাগুলো শিখে নেই। কয়েক দিন পরেই তো চলে যাব। তিনি ছিলেন উক্ত এলাকার মমতাজ ছাত্র। এখানে আসার পর তিনি কাঁদতে ছিলেন। বলতে লাগলেন এত দিন তো আমরা আরবী পড়িয়েছি কোরআন তো পড়াইনি। এখানে থাকার পরই মাশাআল্লাহ কোরআনি কি তা জানতে পারলাম।

পবিত্র কোরআনের বেহুরমতী হচ্ছে বেশি :

বর্তমান সময়ে কোরআনের সম্মানের ক্ষেত্রে অনেক কমতি লক্ষ করা যায়। এক স্থানে আমার যাওয়া হলো। সেখানে কিতাবাদি রাখা ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কারো উস্তাদ যদি বেহুশ হয়ে পড়ে বা কোথাও নিপতিত হয় কিংবা কোনো আঘাত লাগে তখন আপনারা কী করবেন? বলা হলো তাঁর কাপড়চোপড় পাল্টে দেওয়া হবে, পানি ঢালা হবে তার শুশ্রূষা করা হবে। আমি বললাম উস্তাদরা আপনাদেরকে মৌখিক বা লৈখিক শিক্ষা দেন। সুতরাং তারা মৌখিক উস্তাদ। আর যেসব বস্তু আপনাদেরকে নুকুশের মাধ্যমে শিক্ষা দেয় সেগুলো আপনাদের নুকুশের উস্তাদ। এই যে কিতাবগুলো দেখছেন, সেগুলো আপনাদের নুকুশের উস্তাদ। নকশার মাধ্যমে আপনাদের পাঠদান করেন। কিন্তু আপনারা নিজেই দেখুন আপনাদের এই উস্তাদের কী অবস্থা! পাতাগুলো বিক্ষিপ্তভাবে আছে। পড়েছেন আর উঠিয়ে রেখে দিয়েছেন। যেহেতু তা থেকে আপনারা উপকৃত হন সুতরাং এগুলোকে সুন্দরভাবে রাখার চেষ্টা করবেন।

আমি এসব কথা সকালে বলেছিলাম। দেখলাম, যোহরের সময় নতুন নতুন কিতাব আনা হলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনাদের পুরাতন উস্তদগুলোর কী অবস্থা? সেগুলোকে কি এমনি আলমারিতে রেখে দিয়েছেন? নাকি সেগুলোরও কিছু খেদমত করেছেন। আমার ব্যথা হলো, আপনারা কিতাবের সাথে এই আচরণ করছেন তাহলে কোরআন মজীদের কী অবস্থা? দেখলাম, কোরআন মজীদে গিলাফ নেই। আলমারিতে কাপড় বিছানো হয়নি। নিজের কাপড়চোপড় রাখার সময় আলমারিতে কাগজ বিছিয়ে দেন। অন্য কিছু রাখলে সেখানে আপনারা কিছু না কিছু বিছিয়ে দেন। আবার তাতে যেন ধুলাবালি স্পর্শ না করে সে ব্যবস্থা করে থাকেন। কিন্তু কিতাব বা কোরআন মজীদের এভাবে গুরুত্ব দেন না। যেখানে ধুলাবালি আসে সেখানে রেখে দেওয়া হয়, তাতে না কাপড় বিছিয়ে দেন না অন্য কিছু। যাদের বয়স ৪০ হয়েছে তাঁরাও হয়তো দেখেছেন সে সময় জুযদান ছাড়া কোরআন মজীদ রাখা হতো না। কিন্তু এখন যেখানে ইচ্ছা জুযদান ছাড়া পবিত্র কোরআন মজীদ রেখে দেওয়া হয়। যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে রেখে দেওয়া হয়। তাহলে পবিত্র কোরআনের বরকত কিভাবে আমরা অর্জন করব?

ইফাদাতে

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)

বিভিন্ন সময় ছাত্র-শিক্ষক ও সালেকীনদের উদ্দেশে দেওয়া তাকরীর থেকে সংগৃহীত

একটি সর্বগ্রাসী ফেতনা ও তার প্রতিকার

পৃথিবী আজ অসংখ্য অগণিত ফেতনার চারণভূমিতে পরিণত হয়েছে তন্মধ্যে সর্বব্যাপী মৌলিক ফেতনা পেটের ফেতনা, অর্থাৎ উদর পূর্তির নেশা। পেটের পূজা আজ জীবনের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তু ও শখে পরিণত হয়েছে। আর এটা এতই ব্যাপকতা লাভ করেছে যে খুব কমসংখ্যক লোকই এর থেকে বাঁচতে পারছে। ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী, শিক্ষক, প্রফেসর, মুদাররিস, ইমাম–সবাই এই ফেতনায় মাখামাখি। হ্যাঁ, কিছু যে পার্থক্য নেই, তা নয়। তাকওয়া, পরহেযগারী, ইখলাছ, ঈছার এবং স্বল্পে তুষ্টির মতো মহান শিষ্টাচার গুণাবলি এবং প্রতিভার নাম-গন্ধও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। ফলাফল দাঁড়াল এই যে দুনিয়াজোড়া মানুষ হাতে হাতে সুখ-শান্তি, বিলাসিতা এবং বিনোদনের হাজারো উপকরণ সত্ত্বেও লোভ-লালসা, টাকা-পয়সা ও পেট পূজার জ্বলন্ত আগুনে বিদগ্ধ। দুঃখ-কষ্ট, অস্থিরতা-বিশৃঙ্খলা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, অশান্তি-পেরেশানির অন্ত নেই, বিষাদের কালো ছায়া চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। সর্বনাশা এই ফেতনার মূল কারণ সেটাই, যা রহমতে আলম (সা.) চিহ্নিত করেছেন, অর্থাৎ আখেরাতের বিশ্বাস যারপরনাই দুর্বল হয়ে গেছে আর পরকালের নেয়ামত, সুখ-শান্তির, চিন্তা-ভাবনা নিঃশেষ হওয়ার পথে। জাগতিক চাকচিক্যের পেছনে এমনভাবে ছুটন্ত যে আত্মিক বিবেচনায় মানুষের কদর ও মাননির্ণয়ের দিকটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তাই তো ছোট-বড়, সম্মান-অসম্মান ও মহান-অমহান–এসব মানবিক গুণাবলি তাকওয়ার বিবেচনায় করা হয় না, করা হয় পেট আর পকেটের বিবেচনায়। অথচ কোরআনের শাশ্বত বাণী হলো–

ان اكرمكم عند الله اتقاكم

তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মুত্তাকী ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানের অধিকারী। বস্তুবাদের মহাপ্রলয়ে সর্বপ্রথম ঈমান-একীন চির বিদায় নিয়েছে। এরপর মানবিক চরিত্র-শিষ্টাচার বিলীন হয়েছে। তারপর নববী আদর্শের সাথে বন্ধন দুর্বল নড়বড়ে হয়ে নেক আমলের পরিবেশ বিনষ্ট হয়েছে। অতঃপর মুআমালা মুআশারার গাড়ি হয়েছে লাইনচ্যুত। আর নীতি ও সভ্যতার বেজেছে বিদায়ঘণ্টা। বস্তুবাদের কালো তুফান এখন পুরো মানবতাকে পশুত্বের অতল গহ্বরে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে ব্যস্ত। ব্যক্তিগত অনিয়ম-উচ্ছৃঙ্খলা বিপথের অনুগমন এবং নির্দয় ও কঠোরতার সে যুগ এসে গেছে, যার থেকে সবাই পরিত্রাণ পেতে মরিয়া। মোটকথা হলো, উদর পূর্তির সর্বনাশা ফেতনার করাল গ্রাসে পুরো দুনিয়ার কায়া পাল্টে গেছে। দুনিয়াজুড়ে বড় বড় পণ্ডিতদেরও উদর পূর্তির সর্বনাশা ফেতনার উপায়-উপকরণ ও সরঞ্জাম-সামানের সামনে অসহায় মনে হচ্ছে। তাঁরাও এই ফেতনার ভয়াবহ দিকগুলোর প্রতিকার চান; কিন্তু আক্ষেপ হয় এ কারণে যে প্রতিষেধক হিসেবে এমন জিনিসকেই চয়ন করা হয় ও বেছে নেওয়া হয়, যা নিজেই ব্যাধির কারণ। প্রকৃতপক্ষে নবীগণই হলেন মানবিক রোগের নির্ণয়ক। অতএব তাঁদের ব্যবস্থাপনায় এই পেটের রোগীর চিকিৎসা হলে ফলপ্রসূ হবে নিঃসন্দেহে।

রোগ নির্ণয় :

রাসূলুল্লাহ (সা.) চৌদ্দ শতাধিক বছর পূর্বেই ভয়াবহ এ রোগ নির্ণয় করে দিয়েছেন। ইরশাদ করেন,

والله لا الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، فتهلكم كما اهلكتهم

আল্লাহর কসম! তোমাদের ব্যাপারে আমি দরিদ্রতার ভয় করি না। তবে আমার আশঙ্কা হয় তোমাদেরকে অঢেল সম্পদ দেওয়া হবে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর তোমরাও তাদের ন্যায় প্রতিযোগিতামূলক দুনিয়া কামানোর ধান্ধায় পড়বে। আর এভাবেই দুনিয়ার লোভ-লালসা তোমাদেরকে ধ্বংস করবে, যেভাবে তাদেরকে করেছিল। (বুখারী-মুসলীম)। এই হলো সর্বনাশা ফেতনার প্রাথমিক ও মূল কেন্দ্র, যেখান থেকে মানবিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষয় ও ধ্বংস শুরু হয়। অর্থাৎ জাগতিক প্রাচুর্যকে অনেক বড় করে দেখতে শুরু করে, ভাবে দুনিয়া মূল্যবান, মহা মূল্যবান! একসময় দুনিয়ার ধান্ধায় বিভোর হয়ে যায়। আর মেতে ওঠে প্রতিযোগিতামূলক সম্পদ বাড়ানোর নেশায়। বৈধ-অবৈধের তোয়াক্কা না করে গড়তে চায় সম্পদের পাহাড়। সবাইকে ছাড়িয়ে নিজেকে নিয়ে যেতে চায় সম্পদের সপ্তমাকাশে!

প্রতিষেধক :

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শুধুমাত্র রোগ নির্ণয় করেই

ক্ষান্ত হননি। দিয়েছেন এর প্রতিষেধকও, যা দুই ভাগে বিভক্ত।

১। ইতেকাদী/বিশ্বাসগত।

২। আমলী/প্র্যাকটিক্যাল।

ইতেকাদী প্রতিষেধক :

ইতেকাদী প্রতিষেধক হলো এই বাস্তবতাকে সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে দুনিয়াতে আমরা কয়েক দিনের মেহমান মাত্র। এখানের সুখ-শান্তি যেমন চিরস্থায়ী নয়, তেমনি দুঃখ-কষ্টও চিরস্থায়ী নয়। এখানের ভোগ-বিলাসিতা আখেরাতের স্থায়ী নেয়ামত সুখ-শান্তি ও ভোগ-বিলাসিতার সামনে কিছুই নয়। পবিত্র কোরআনে রয়েছে এর প্রতি দাওয়াত এবং অসংখ্য স্থানে এই বাস্তবতার বর্ণনা। ইরশাদ করেন,

بل تؤثرون الحيوة الدنيا والآخرة خير وابقى

কান খুলে শোনো! তোমরা আখেরাতকে গুরুত্ব না দিয়ে পার্থিব জীবনকে তার ওপর প্রধান্য দাও অথচ আখেরাত দুনিয়া থেকে বহুগুণে উত্তম এবং চিরস্থায়ী। (সূরা আ'লা : ১৬-১৭)

আমলী প্রতিষেধক :

এই রোগের আমলী/প্র্যাকটিক্যালি প্রতিষেধক হলো, দুনিয়াতে থাকাবস্থায় আখেরাতের প্রস্তুতিতে লেগে যাওয়া। আর এই নিয়তে হারাম এবং সন্দেহজনক উপার্জন থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকা, পরিত্যাগ করা। দুনিয়ার মজা ও প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ থেকে বিরত থাকবে। পর্থিব ধন-সম্পদ, সহায়-সম্পত্তি, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়স্বজন, বংশ ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন রক্ষা করাকে বাধ্যতামূলক কর্তব্য মনে করে বাড়াবাড়ি না করে সে অনুপাতেই রক্ষা করে চলবে। বিলাসী জীবনযাপনের জন্য কোনোটিকেই আপন করে নেওয়া যাবে না। এবং জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বানানো যাবে না। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন,

ايـاكـم والتـنـعـم فـان عبـاد الله ليسو بالمتعمين

ভোগ-বিলাসী জীবনযাপন থেকে বিরত থাকো। কারণ আল্লাহর প্রকৃত বান্দারা বিলাসী হয় না। (আহমদ)

আশ্চর্য কথা হলো, যদি ডাক্তার এই পরামর্শ দেন যে দুধ, ঘি, গোশত, মিষ্টি ইত্যাদি আপনার জন্য ক্ষতিকর তবে তো তাঁর পরামর্শ বাস্তবায়নে দুনিয়ার সমস্ত নেয়ামতকে পরিহার করা হয়। অথচ রহমতে দু'আলম (সা.)-এর স্পষ্ট নির্দেশনা ওহীয়ে এলাহীর পরিষ্কার বিধানের পরও ন্যূনতম শখকে পরিহার করে এড়িয়ে চলা সহ্য করা হয় না। রাসূল (সা.)-এর জীবনব্যবস্থা, তাঁর পরিবারের জীবনব্যবস্থা ও সাহাবায়ে কেরামের জীবনব্যবস্থা পরখ করলে প্রতিভাত হয় যে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতা ও মনলোভা চাকচিক্যের প্রতি আন্তরিক মোহ উন্মাদনা বৈ কিছু নয়। বুখারী শরীফে হযরত আবু হুরাইরা (রা.)-এর একটি শিক্ষণীয় ঘটনা বর্ণিত আছে যে তিনি একদা কিছু লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, যাঁদের সামনে ভুনা গোশত পরিবেশিত ছিল। তাঁরা হযরত আবু হুরাইরা (রা.)-কে তাঁদের সাথে খাওয়ার আহবান করেন। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন, রাসূল (সা.) এমন অবস্থায় দুনিয়া ত্যাগ করেছেন যে তিনি পেটপুরে জবের রুটিও খেয়ে দেখেননি। (বুখারী) মাসের পর মাস চলে যেত; কিন্তু নববী নীড়ে রাতে চেরাগ প্রজ্বলিত হয়নি। দিনের বেলায় চুলায় আগুন জ্বলেনি। পানি আর খেজুরই হতো একমাত্র জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম। তাও আবার কখনো থাকলে কখনো থাকত না। লাগাতার তিন দিন পর্যন্ত কিছু না খেয়ে দিনাতিপাত করতে হয়েছিল। কোমরের বল অক্ষুণ্ন রাখার জন্য পেটে পাথর পর্যন্ত বেঁধেছেন। এই অবস্থায় রণ ময়দানে অংশগ্রহণও করেছেন। মোট কথা, যুহদ তাকওয়া, তুষ্টি, উঁচু সাহসিকতা, কষ্টসহিষ্ণু এবং দুনিয়ার প্রতি অনীহা, ঘৃণা, বিমুখতা ছিল সীরাতে তাইয়্যেবার স্বাতন্ত্র্য নিদর্শন। নিজেদের সার্বিক অবস্থার সাথে ওই পবিত্র জীবনব্যবস্থার তুলনা করে প্রত্যেকেরই লজ্জিত হওয়ার কথা। আমাদের সব কিছুই তো পেট আর রুটিকেন্দ্রিক অথচ নববী জীবনে এর প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপই ছিল না। আর এটাই সত্য যে কষ্টসহিষ্ণু জীবননীতি স্বেচ্ছায় বরণ করেছেন যেন পরবর্তী প্রজন্মের ওপর আল্লাহর হুজ্জতের পূর্ণতা লাভ হয়। একটু ভেবে দেখুন! যদি রাসূল (সা.) চাইতেন তবে আল্লাহর পক্ষে কোন জিনিসটি দেওয়া হতো না? সব কিছুই পেশ করা হয়েছে; কিন্তু গ্রহণ করা হয়নি। দেখুন! মনলোভা পার্থিব উপায়-উপকরণ যার জন্য আমরা মরিয়া আল্লাহর নিকট এতটাই নিকৃষ্ট যে নিজের প্রিয় বান্দাদের গায়ে তার ছিটাও লাগতে দেন না। ব্যতিক্রম দু-একটি ঘটনা পাওয়া গেলেও সেসব বান্দার তাকওয়া, পরহেযগারী, দুনিয়া বিমুখতার মধ্যে কোনো চিড় ধরেনি। তাদের কাছে যা ছিল তা অন্যের জন্য, নিজের জন্য নয়।

পরিসংহার :

পেটের ফেতনার সঠিক প্রেসক্রিপশন তো সেটাই, যা রাসূল (সা.) প্রদান করেছেন। কোনো ব্যক্তি যদি পেটের ফেতনা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে তবে সে যৌনবাহিত ফেতনা থেকেও নিরাপদ থাকবে। রতি তাড়না তো পেটুকদের ঘাড়েই বেশি চেপে বসে। ক্ষুধার্তের এই তাড়নার ফুরসত কোথায়? পেট ও যৌন পূজা থেকে বাঁচার নামই তাকওয়া। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে সর্বপ্রকার ফেতনামুক্ত থেখে নববী আদর্শে আদর্শবান হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

বিন্যাস ও গ্রন্থনা :
মুফতী নূর মুহাম্মদ

ঘুষ : একটি পুরনো অভিশাপ

মুফতী রিদওয়ানুল কাদির

ঘুষের ইতিহাস অনেক পুরনো। এটি এ যুগে সৃষ্ট কোনো সমস্যা নয়। হ্যাঁ, অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই যে ঘুষকে কোনো যুগে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা সম্ভবপর হয়নি। বর্তমান আধুনিক বিশ্বে সর্বত্র ঘুষ বা উৎকোচের জয়জয়কার। গণতান্ত্রিকব্যবস্থায় ঘুষ ব্যতীত এক কদমও চলা সম্ভব নয়। ঘুষ ইনসাফ ও সাম্য প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে বড় অন্তরায়। বর্তমানে সৎ পথের যেমন অভাব নেই, তেমনি অসৎ পথের সংখ্যাও অগণিত। এখন বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা মানুষকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে সে কোন পথের পথিক হবে? ঘুষ, যা মূলত আমাদের সমাজের একটি পুরনো ক্ষত, জানা নেই এর নখরাঘাতে কত জীবন ওলট-পালট হয়ে গেছে? কিন্তু তবুও এর প্রবল স্রোতকে থামিয়ে দেওয়ার কোনো কার্যকর কর্মসূচি পরিলক্ষিত হচ্ছে না। বর্তমান আধুনিক বিশ্বে উৎকোচের কোনো পদ্ধতি নির্দিষ্ট নেই। বর্তমানে কেবল টাকার মধ্যে ঘুষের আদান সীমাবদ্ধ নেই। বরং বর্তমানে হাদিয়া-তোহফাও ঘুষের প্রতিনিধিত্ব করে যাচ্ছে। অন্য ভাষায় ঘুষ বলা হয়, কাউকে মূল্যবান কোনো কিছু দেওয়া যেন তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে তাকে প্রভাবিত করা যায়। এটাকে কমিশন বা ডোনেশন যে নামেই অবহিত করা হোক না কেন, মূল বাস্তবতা কিন্তু একটিই। ঘুষ নিজেই একটি মারাত্মক অভিশাপ, যার ফলে মানুষ আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে যায়; কিন্তু অসহায়, নিঃস্বের কাছে ঘুষ দাবি করাটা মানবতার গালে জোরে চপেটাঘাতই বটে। যেমন–অনেক জায়গায় কয়েদিদের সাথে যারা সাক্ষাৎ করতে আসে, তাদের কাছ থেকে এই শর্তে ঘুষ আদায় করা হয় যে ঘুষ দিলে কয়েদির সাথে খারাপ আচরণ করা হবে না। ইসলাম প্রতিটি ওই উপার্জনকে অবৈধ ঘোষণা করেছে, যেখানে কারো দুর্বলতাকে পুঁজি করে তাকে জিম্মি করা হয়। তন্মধ্যে অন্যতম হলো উৎকোচ বা ঘুষ। ঘুষ আমাদের মাঝে মহামারির আকার ধারণ করেছে। ঘুষের মূলোৎপাটনে কর্তা ব্যক্তিরা মুখরোচক অনেক কথা বললেও তা কাজির গরু কেতাবে আছে, গোয়ালে নেই এর মতোই। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও মেডিক্যালেও যখন এই ঘুষের ছড়াছড়ি দেখতে পাই, তখন দুঃখের কোনো সীমা-পরিসীমা থাকে না। ঘুষ সম্ভবত এমন সর্বজনীন অপরাধ, যাকে কোনো জীবনব্যবস্থায় অনুমোদন দেয় না। আমাদের রাষ্ট্রীয় আইনেও ঘুষ মারাত্মক অপরাধ। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজ কোথায় নেই ঘুষ আর উৎকোচ? রাষ্ট্রের কোন প্রতিষ্ঠানটি এই মহামারি থেকে মুক্ত? একজন সাধারণ কনস্টেবল থেকে নিয়ে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ অফিসার, সবাই এই মহামারিতে আক্রান্ত। যার অবশ্যম্ভাবী ফল হলো, যার পকেট গরম থাকবে, সে হাজারো অপরাধ করা সত্ত্বেও সে বুক ফুলিয়ে সমাজে দাপিয়ে বেড়াবে। আর যে কপর্দকশূন্যহবে সে শতভাগ নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও আইনের মারপ্যাঁচে পড়ে নিজের মূল্যবান জীবনকে খুইয়ে বসবে। ইসলামী শাসনব্যবস্থাই পারে জাতিকে এই দুর্গতির হাত থেকে রক্ষা করতে। যদি উঁচু শ্রেণীর ঘুষখোর অফিসারদেরকে কয়েকবার জনসমক্ষে শিক্ষণীয় শাস্তির সম্মুখীন করা হয় এবং ভবিতব্যে ঘুষ আদান-প্রদানের ওপর কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে ঘুষের এই লা'নত আমাদের সমাজ থেকে লেজ গুটিয়ে পালাতে বাধ্য হবে। (ইসলাম আওর জদীদ মা'আশী মাসায়েল-৭/৯৭)

ঘুষের সংজ্ঞা :

ارشا . ارشا এর মূল ধাতু হলো رشوة বলা হয় ওই রশিকে, যার মাধ্যমে পানি পর্যন্ত পৌঁছা যায়। যেহেতু ঘুষের মাধ্যমেও নিজের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করা যায়, তাই তাকে রিশওয়াত বলা হয়। এই শব্দটা রার (ر) ওপর পেশ এবং রার (ر) নিচে যের উভয় ধরনের পড়া যায়। ঘুষদাতাকে راشـــى (রাশী) আর ঘুষগ্রহীতাকে مـــرتشى (মুরতাশী) আর উভয়ের মাঝে ঘুষের যে লেনদেন, তাকে راش (রাশ) বলা হয়। (ইবনুল আছীরকৃত আন-নেহায়া-২/২৬২)

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন,

لعن الله الراشى والمرتشى والرائش

ঘুষদাতা, ঘুষগ্রহীতা, উভয়ে মাঝখানে মধ্যস্থতাকারী–সবার ওপর আল্লাহর লা'নত। (আল-মুজামুল কবীর লিত্তাবরানী-১৪১৫)

আল্লামা শামী (রহ.) ঘুষের অনেক অর্থবহ সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ঘুষ বলা হয় ওই উপঢৌকনকে, যা কোনো ব্যক্তি কোনো বিচারককে অথবা অন্য কাউকে এই জন্য দেয় যেন বিচারক তার পক্ষে ফয়সালা করে অথবা তাকে ওই দায়িত্ব অর্পণ করে যে দায়িত্বের সে প্রত্যাশী। (শামী ক্বাযা অধ্যায়) তিনি উপরোক্ত বক্তব্যে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে ঘুষ ব্যাপক সেটি সম্পদও হতে পারে অথবা অন্য

কোনো বস্তুও হতে পারে। এখানে বিচারক থেকে উদ্দেশ্য হলো জজ। সংজ্ঞায় বর্ণিত অন্য কেউ থেকে উদ্দেশ্য হলো, যাকে ঘুষ দেওয়ার দ্বারা তার স্বার্থ চরিতার্থ হবে। সে যেই হোক না কেন? সে বিচারকও হতে পারে, তেমনি সরকারি কর্মকর্তা অথবা বিশেষ কোনো কাজের দায়িত্বশীলও হতে পারে। যেমন–ব্যবসায়ী এবং বিভিন্ন কোম্পানির প্রতিনিধিবৃন্দ। ফয়সালা করা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, উৎকোচগ্রহীতা উৎকোচদাতার চাহিদা মতে ফয়সালা করবে। যেন উৎকোচদাতার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। সিদ্ধান্ত সঠিক হোক বা মিথ্যা হোক। (বিন বাযের ফতোয়া এবং প্রবন্ধাবলী-৩২৪)

ফিকহর পরিভাষায় ঘুষ বলা হয়,

مايعطى لابطال حق واحقاق باطل

অর্থাৎ যা কোনো সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য অথবা কোনো নির্জলা মিথ্যাকে সত্য প্রমাণিত করার জন্য দেওয়া হয়। (আত-তারীফাত-১২৫)

ঘুষের শরয়ী সংজ্ঞা হলো, যার বিনিময় নেওয়া শরয়ীভাবে অননোমোদিত, তার বিনিময় গ্রহণ করা। যেমন একটি কাজ করা কোন ব্যক্তির দায়িত্বের আওতায় পড়ে, সে কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য কোনো পক্ষ থেকে বিনিময় নেওয়া। যেমন–সরকারি কর্মকর্তা প্রমুখ। সরকারি চাকরির সুবাদে যে কাজগুলো তার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত তা করার বিনিময়ে যদি কারো কাছ থেকে বিনিময় গ্রহণ করা হয় তাই উৎকোচ বা ঘুষ। তেমনিভাবে সন্তান-সন্ততির বিয়ের ব্যবস্থা করা পিতা-মাতার কর্তব্য এখন পিতা-মাতা এই বিয়ের পরিবর্তে কিছু নিলে তা উৎকোচ হিসেবে বিবেচিত হবে। অথবা নামায, রোজা, হজ ও কোরআনের তেলাওয়াত–এগুলো মুসলমানের ওপর অত্যাবশ্যকীয় ইবাদত, এগুলোর বিনিময় নেওয়া হলে তা ঘুষ বলে বিবেচিত হবে। তবে পরবর্তী ফুকাহাদের মতে, বর্তমান যুগে কোরআন শিক্ষা দেওয়া ও সাধারণ নামাযের ইমামতীর বিধান উপরোক্ত বিধান থেকে ভিন্ন। যে ব্যক্তি ঘুষ নিয়ে কোনো একটি কাজ হক্বভাবে আঞ্জাম দেবে সে ঘুষ নেওয়ার কারণে গোনাহগার হবে এবং এই সম্পদ তার জন্য হারাম হবে। আর যদি ঘুষ নিয়ে মিথ্যা ফয়সালা করে, তাহলে মারাত্মক অপরাধ অন্যের হক্ব বিনষ্ট করা এবং আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তন করে দেওয়ার নামান্তর। আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মুসলমানকে এই অভিশাপ থেকে রক্ষা করুন। (মাআরিফুল কোরআন ৩/১৫২-১৫১)

ঘুষের অভিশাপ :

ঘুষখোর সম্পর্কে কোরআনের ভাষ্য হলো নিম্নরূপ–

سماعون للكذب اكالون للسحت

অর্থাৎ, এরা মিথ্যা বলার জন্য গুপ্তচরবৃত্তি করে, হারাম ভক্ষণ করে। (মায়িদা-৪২) سحت এর শাব্দিক অর্থ হলো, কোনো জিনিসকে মূল থেকে উপড়ে ফেলা। কোরআনের অন্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে

فيسحتكم بعذاب

অর্থাৎ, তোমরা যদি অসৎ কর্ম থেকে ফিরে না এসো, তাহলে তোমাদেরকে গোড়াসমেত ধ্বংস করে দেব। কোরআনের প্রথম আয়াতে سحت থেকে উদ্দেশ্য হলো উৎকোচ তথা ঘুষ। হযরত আলী (রা.) ইবরাহীম নখয়ী (রহ.) হাসান বসরী, মুজাহিদ, কাতাদা এবং জাহহাক প্রমুখ মুফাসসিররা সুহতের তাফসীর ঘুষ দিয়েই করেছেন। ঘুষকে সুহত দ্বারা ব্যাখ্যা করার অন্তর্নিহিত রহস্য হলো, ঘুষ কেবল লেনদেনকেই বরবাদ করে দেয় না, বরং যে দেশে ঘুষের ব্যাপক প্রচলন হয়ে যায়, সে দেশের শন্তি-শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তাকে চরম হুমকির মুখে ফেলে দেয়। ওই দেশের আইনশৃঙ্খলা চরমভাবে বিঘ্নিত হয়। আর আইনশৃঙ্খলা হলো দেশের ওই মৌলিক বস্তু, যার কারণে দেশে শান্তি-স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। তা হুমকির মুখে পড়ার সরল অর্থ হলো জনসাধারণের জান-মাল, সম্ভ্রম–সব কিছু হুমকির মুখে পড়া। এ জন্য ইসলামী শরীয়তে ঘুষকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে এবং ঘুষের দরজা বন্ধ করার জন্য শাসনকর্তা এবং বিচারপতিদেরকে যেকোনো ধরনের তোহফা-উপঢৌকনকেও ঘুষ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। (মাআরিফুল কোরআন-৩/১৫১)

কোরআনের এক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে–

ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون

অর্থ, তোমরা অন্যায়ভাবে একে-অপরের সম্পদ ভোগ করো না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনেশুনে পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসক কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিও না। (আল-বাকারা-১৮৮)

উক্ত আয়াত থেকে বোঝা গেল, অবৈধ পন্থায় অন্যের সম্পদ ভক্ষণ করার যত পদ্ধতি আছে, তন্মধ্যে নিকৃষ্ট পন্থা হলো ঘুষ। কেননা, তাতে কোনো ব্যক্তিকে সম্পদ দিয়ে তাকে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করার অপপ্রয়াস চালানো হয়। হযরত ইবনে ওমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন,

كل لحم انبته السحت فالنار اولى به

প্রত্যেক ওই গোশত, যা অবৈধ সম্পদ দ্বারা পরিপুষ্ট হবে, জাহান্নামের আগুনই তার জন্য অধিক উপযুক্ত। কেউ প্রশ্ন করল অবৈধ সম্পদ দ্বারা উদ্দেশ্য কী? তখন প্রত্যুত্তরে নবী (সা.) ইরশাদ করেন الرشوة فى الحكم অর্থাৎ, কোনো ধরনের ফয়সালা করার নিমিত্তে ঘুষ গ্রহণ করা। (তাফসীরে ইবনে জারীর তবরী-৬/১৫৬)

হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি,

ما من قوم يظهر فيهم الربوا الا اخذوا بالسنة وما من قوم يظهر فيهم الرشا الا اخذوا بالرعب

যখন কোনো জাতির মাঝে সুদের ব্যাপক প্রচলন হয়ে যায় তখন তারা দুর্ভিক্ষে পতিত হয়। আর যখন তাদের মাঝে ঘুষের আধিক্য দেখা দেয়, তখন তারা শত্রুর ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে। (মুসনাদে আহমদ-৪/২০৫)

সমাজে যখন গোনাহের প্রচলন হয়ে যায়, তখন সমাজে বিশৃঙ্খলা প্রকট আকার ধারণ করে। সমাজের সদস্যদের সম্পর্কে ফাটল ধরে। পরস্পরে শত্রুতা হিংসা-বিদ্বেষ জন্ম নেয়। ঘুষের ব্যাপক প্রচলনের ফলে সমাজে যে খারাপ প্রভাব পড়ে তন্মধ্যে অন্যতম হলো, অশ্লীল ও মন্দ কথার ব্যাপক প্রচলন হয়ে যায়। এভাবে যখন গোনাহের ব্যাপক প্রচলনের ফলে একজন-অপরজনের হক্ব নষ্ট করে তখন একে-অপরের প্রতি অত্যাচার করতে পারাকে নিজের ক্রেডিট জ্ঞান করে। এটাই হলো জুলুমের খারাপ প্রভাব। যার ফলে সমাজের ফেতনা-ফ্যাসাদের দরজা উন্মুক্ত হয়ে যায়। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যখন মানুষ মন্দ কাজ হতে দেখেও তা প্রতিরোধের ব্যবস্থা না করে তখন আল্লাহ সবার ওপর আজাব নাজিল করেন। (বিন বাযের ফাতাওয়া এবং প্রবন্ধাবলী-৩২৮)

ঘুষের মন্দ (পরিণাম) প্রভাব :

ঘুষের কারণে যেসব খারাপ প্রভাব সমাজে পড়ে তন্মধ্যে একটি হলো, ঘুষের কারণে দুর্বল ও নিঃস্বদের ওপর অত্যাচার হয়। তাদের অধিকার সম্পূর্ণভাবে খর্ব করা হয়। অথবা অবৈধ পন্থায় শুধুমাত্র ঘুষের কারণে তাদের প্রাপ্য অধিকার অর্জনে বিলম্ব হয়। ঘুষের একটি খারাপ প্রভাব এটিও যে ঘুষখোর বিচারক এবং সরকারি কর্মচারীদের নৈতিকতায় ধ্বংস নেমে আসে। তারা নফস পূজার প্রতি ধাবিত হয়ে যায়। যারা ঘুষ দিতে চায় না, তাদের অধিকার সম্পূর্ণ বিনষ্ট করা হয় অথবা তাদের পক্ষে রায় দিতে অযথা টালবাহানা করা হয়। উৎকোচগ্রহীতার ঈমান মারাত্মকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। সে নিজেকে দুনিয়া-আখেরাতের কঠিন শাস্তির মুখোমুখি করতে প্রস্তুত করে। আল্লাহ তা'আলা যদি তৎক্ষণাৎ শাস্তি প্রদান নাও করেন, তার অর্থ (নাউজুবিল্লাহ) এটা নয় যে তিনি তার অবস্থা সম্পর্কে উদাসীন কিংবা অনবহিত। বরং অনেক সময় এটাও হয় যে আখেরাতের শাস্তির পূর্বে তাকে দুনিয়াতেও কিছু শস্তির নমুনা দেখানো হয়। যেমন–সহীহ হাদীসে বিবৃত হয়েছে, আল্লাহর অবাধ্যচারণ করা, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা এমন মারাত্মক গোনাহ যে দুনিয়াতেও তাকে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হয়। আর আখেরাতে তার জন্য যে শাস্তি প্রস্তুত করা হয়েছে, তা ভিন্ন। ঘুষ এবং জুলুমের প্রায় প্রকার এই আল্লাহর অবাধ্যাচরণের সাথে সম্পৃক্ত, যা এই হাদীসে সুস্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা জালিমকে একটু ঢিল দিয়ে থাকেন। কিন্তু যখন তাকে পাকড়াও করেন তখন আর তাকে ছেড়ে দেন না। অতঃপর রসূল (সা.) নিম্নোক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন–

وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرىٰ وهى ظالمة ان اخذه اليم شديد

আর আপনার প্রতিপালক যখন কোনো পাপাকীর্ণ জনপদকে ধরেন তখন এমনিভাবেই ধরে থাকেন। নিশ্চয়ই তাঁর পাকড়াও খুবই মারাত্মক, বড়ই কঠোর। (সূরা হুদ-১০২) (মাকালাত ও ফাতাওয়া আব্দুল আজীজ বিন আব্দুল্লাহ বিন বাজ-৩২৯)

উৎকোচ দেওয়া-নেওয়া :

রাসূল (সা.) ঘুষ দেওয়া-নেওয়া উভয়টাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। তবে হ্যাঁ, ঘুষ নেওয়াটা সত্তাগতভাবে হারাম, যা কোনোক্রমেই বৈধ হতে পারে না। কিন্তু ঘুষ দেওয়াকে হারাম করার কারণ হলো, যেহেতু ঘুষ দেওয়ার মাধ্যমে ঘুষগ্রহীতাকে তার অসৎ কর্মে উৎসাহিত করা হয় আর সাধারণত ঘুষ দেওয়ার কারণ হলো অসৎ পথে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করা অথবা অপরকে তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। এ জন্য ঘুষ দেওয়াটাও হারাম।

আল্লামা ইবনে নুজাইম মিসরী এই কথাটিকে এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে–

ما حرم اخذه حرم اعطائه

(আল আশবাহ ওয়ান নাজায়ের- ১/৩)

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এবং আমাদের পুরো সমাজকে ঘুষের অভিশাপ থেকে নিষ্কৃতি দান করুন। আমীন।

মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-২৪

মাওলানা আনোয়ার হোসাইন

চেক (Bank Cheque)

চেকের সংজ্ঞা :

চেক এক প্রকারের লিখিত এবং সাইনকৃত নির্দেশনামা, যাতে ব্যাংকের কোনো অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের অ্যাকাউন্ট থেকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের টাকা অন্য কাউকে আদায় অথবা স্থানান্তরের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

(تعارف زر وبینکاری ٢٢٣)

ড. মুহাম্মদ ওসমান শিব্বির চেকের সংজ্ঞায় বলেন,

الشيك مأخوذ من الصك وهو وثيقة بمال او نحوه والشيك محرر يتضمن امر مكتوبا يطلب به الساحب من المسحوب عليه (المصرف) ان يدفع بمجرد الاطلاع عليه مبلغا معينا من النقود لشخص معين او لاذنه او لحامله (المعاملات المالية العصرية فى الفقه الاسلامى)

অর্থাৎ চেক আরবী শব্দ صك থেকে উৎকলিত। চেক, মাল ইত্যাদির ডকুমেন্টকে বলা হয় এবং চেক একটি পত্র যাতে এমন নির্দেশ লেখা থাকে যে যার মাধ্যমে লেখক ব্যাংকের নিকট এমন চাহিদা পেশ করে যে ব্যাংক এর ওপর অবগত হওয়ার পর টাকার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা তার অনুমতিক্রমে অথবা বাহক (Bearar)-কে প্রদান করবে।

ড. জঈদ চেকের সংজ্ঞায় লেখেন–

هو امر مكتوب وفقا لاوضاع حددها العرف يطلب به الآمر (الساحب) من المسحوب عليه ويكون بنكا غالبا ان يدفع بمقتضاه وبمجرد الاطلاع مبلغا معينا لاذن شخص معين او لحامله۔ (احكام الاوراق النقدية ٣٦٠)

উক্ত সংজ্ঞার সারমর্মও পূর্বোক্ত সংজ্ঞার মতোই।

ড. আগরওয়ালের ভাষায় চেকের সংজ্ঞা–

A cheque is an instrument containing an unconditional order. singed by the depositor, directing his banker to pay on demand a definite sum of money to himself of to the person named therein or the bearer of the cheque. (introduction to Economic Principles)

অর্থাৎ চেক এমন একটি মাধ্যম, যা শর্তহীন বিধানসম্বলিত এবং এর ওপর ডিপোজিটরের সাইন থাকে। যাতে সে নিজের ব্যাংকারকে উদ্দেশ্য করে লিখে যে, চাহিবামাত্র টাকার বিশেষ একটি পরিমাণ তাকে অথবা এতে যার নাম থাকে অথবা বাহককে প্রদান করবে।

চেকের পক্ষসমূহ :

সাধারণত যেকোনো চেকের তিনটি পক্ষ হয়ে থাকে। (ক) চেক সইকারী ব্যক্তি (Drawer)। (খ) আদিষ্ট, যা সাধারণত ব্যাংক হয়ে থাকে (Drawee)। (গ) প্রাপক (Payee)। ক. দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওই ব্যক্তি, যিনি চেক ইস্যু করে এবং এর ওপর সাইন করে। খ. দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওই পক্ষ যাকে চেক পেশ করা যায়। অর্থাৎ আদিষ্ট, যা সাধারণত ব্যাংকই হয়ে থাকে। গ. দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওই ব্যক্তি, যিনি চেকে উল্লিখিত টাকা পাবেন অর্থাৎ প্রাপক।

চেক (Bank Cheque) এবং হস্তান্তরযোগ্য দলিল (Bill of Exchange)-এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু পার্থক্য :

১. হস্তান্তরযোগ্য বিল যে কারো নামে ইস্যু করা যেতে পারে। অথচ চেক কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নামেই ইস্যু করা যায়।

২. হস্তান্তরযোগ্য বিল যার নামে ইস্যু করা হয় তার পক্ষ থেকে উক্ত বিল গ্রহণ করা জরুরি অথচ চেকের মধ্যে তা জরুরি নয়।

৩. হস্তান্তরযোগ্য বিল পরিশোধ চাহিদা বা ভবিষ্যতের কোনো নির্দিষ্ট তারিখের ওপরই হয় অথচ চেকের পরিশোধ চেকের ওপর লিখিত তারিখ মতে চাহিদার ওপরই হয়।

৪. হস্তান্তরযোগ্য বিল ক্রস করা যায় না অথচ চেককে ক্রস করা যায়।

৫. হস্তান্তরযোগ্য বিলে ডিসকাউন্ট হতে পারে অথচ চেকের মধ্যে কোনো প্রকারের ডিসকাউন্ট হতে পারে না।

৬. হস্তান্তরযোগ্য বিলে উল্লিখিত টাকার পরিমাণ কিস্তিতে আদায় করা যায় অথচ চেকের মধ্যে উল্লিখিত টাকা কিস্তিতে আদায় করা যায় না।

চেকের প্রসিদ্ধ কিছু প্রকার :

ব্যাংক চেকের অনেক প্রকার রয়েছে তন্মধ্যে বিশেষ কিছু প্রকার নিম্নে তুলে ধরা হলো–

(১) বাহক চেক (Bearar Cheque) এটা চেকের সাধারণ ও সাদাসিদে একটা প্রকার। এ ধরনের চেক ব্যাংকে যেই ব্যক্তিই পেশ করুক না কেন ব্যাংক নির্ধিদ্বায় তা পেমেন্ট করে। এ ধরনের চেকের দায়ভার ব্যাংক কখনো গ্রহণ

করে না। কেননা ব্যাংকের ওপর এ ধরনের চেক যাচাই-বাছাই করার কোনো দায়িত্ব অর্পিত হয় না যে অ্যাকাউন্ট হোল্ডার উক্ত চেক যার নামে ইস্যু করেছে ক্যাশকারী আদৌ উক্ত ব্যক্তি কি না? তাই ওই ধরনের চেক ব্যাংকে পেশ করলেই ব্যাংক টাকা দিয়ে দেয় তবে শর্ত হলো চেকের যাবতীয় নিয়মের ব্যত্যয় না ঘটাতে হবে।

(২) হুকুম চেক (Order Cheque)

এ ধরনের চেকে যার নামে ইস্যু করা হয় ব্যাংক ওই ব্যক্তির নাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়ার পর টাকা আদায় করে। ব্যাংকের দায়িত্ব হলো যার নামে চেক ইস্যু করা হয় সে ব্যতীত অন্য কেউ যাতে ক্যাশ করতে না পারে।

(৩) দাগ কাটা চেক (Cross Cheque)

এ ধরনের চেক অত্যন্ত নিরাপদ চেক হয়। কেননা ওই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যার নামে উক্ত চেক ইস্যু করা হয়। সে ব্যতীত অন্য কেউ উক্ত চেক ক্যাশ করার সুযোগ থাকে না। ফলে এতে জালিয়াতির আশঙ্কা খুবই ক্ষীণ হয়। উক্ত চেক অ্যাকাউন্টে জমা করা হয় সরাসরি ক্যাশ হয় না এবং এর মধ্যে কোনো প্রকারের চুরির আশঙ্কাও থাকে না।

(৪) অগ্রিম চেক (Post Dated Cheque)

যা আগামীর কোনো তারিখের জন্য ইস্যু করা হয়। যথা–আজকে ১৭ জানুয়ারি ২০১৬ ইং একজন ব্যবসায়ী কোনো পাওনা পরিশোধের ক্ষেত্রে অন্য কোনো ব্যবসায়ীর নামে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখের চেক দিল। এ ধরনের চেকের উদ্দেশ্য বিলম্বে পরিশোধ করা। যাতে আদায়কারী সহজেই উক্ত সময়ের মধ্যে নিজের অ্যাকাউন্টে টাকা জমা করতে পারে এবং চেকগ্রহীতা নিশ্চিত থাকতে পারে যে চেকে উল্লিখিত তারিখে টাকা পেয়ে যাবে। এ ধরনের চেক নির্দিষ্ট তারিখের আগে ক্যাশ করা যায় না।

চেকের অমর্যাদা ও প্রত্যাখ্যানের কারণসমূহ

নিম্নোক্ত কারণসমূহের ভিত্তিতে ব্যাংক কোনো চেকের অমর্যাদা বা প্রত্যাখ্যান (Dishonour) করতে পারে।

১. স্বাক্ষর না মিললে অর্থাৎ চেকের স্বাক্ষর এবং নমুনা স্বাক্ষর মিল না থাকলে।

২. নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে পেশ করলে।

৩. নির্দিষ্ট তারিখের পরে পেশ করলে।

৪. অ্যাকাউন্টে পর্যাপ্ত টাকা না থাকলে।

৫. অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের মৃত্যু হলে। ৬. ব্যাংক দেউলিয়া হলে। ৭. আদালত এ-সংক্রান্ত ডিক্রি জারি করলে। ৮. চেকের মধ্যে কোনো প্রকার বিকৃতি হলে। ৯. টাকার পরিমাণে গরমিল হলে। ১০. স্বাক্ষরের মধ্যে প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া হলে।

চেকের শরয়ী বিধান :

চেকের শরয়ী বিধানের মধ্যে চেকের বিভিন্ন প্রকার এবং বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে উলামায়ে কেরামের বিভিন্ন মত পাওয়া যায় যে, চেক এটা হাওয়ালা না কি ওয়াকালা? না অন্য কিছু? আমরা এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এ বিষয়ে অতীব জরুরি সারসংক্ষেপ তুলে ধরার প্রয়াস পাব। সায়্যিদ মুহাম্মদ বাকির আল সদর তাঁর রচিত গ্রন্থ আল ব্যাংকুল লা রিবাভী ফিলে ইসলামে চেকের শরয়ী বিধান সম্পর্কিত যেই আলোচনা পেশ করেছেন তার সারসংক্ষেপ হলো। চেকের মধ্যে চেক ইস্যুকারী সাধারণত ঋণগ্রহীতা (Debtor) হয়ে থাকে এবং প্রাপক (Beneficiary) সাধারণত ঋণদাতা (Creditor) হয়। তাই ঋণগ্রহীতা ব্যাংকের উদ্দেশ্যে চেক ইস্যু করে এবং তা ঋণদাতাকে হস্তান্তর করে, যাতে তার ঋণ পরিশোধ হয়ে যায়। এ পর্যায়ে ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্টে কখনো ব্যালেন্স থাকে আবার কখনো থাকে না বরং ওভার ড্রাফটের মু'আমালা হয় তাই উপরোক্ত অবস্থাদ্বয়ের বিধান পেশ করা হচ্ছে।

প্রথম অবস্থা : যদি চেক ইস্যুকারী স্বয়ং নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা উত্তোলন করে তাহলে এটা কেবল নিজের করজ উসুল করা যাকে استيفاء دين বা ঋণ প্রাপ্তি বলা হয়। তাই এমতাবস্থায় যদি চেক ইস্যুকারী প্রাপকের Benificiary ঋণগ্রহীতা হয় এবং সে উক্ত চেক লিখে প্রাপক (Beneficiary)-কে দিয়ে দেয় এটা হবে হাওয়ালা। শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা বৈধ। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা দায়মুক্ত হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় অবস্থা : চেক ইস্যুকারীর যদি ব্যাংকে কোনো ব্যালেন্স না থাকে এবং এটা যদি ওভার ড্রাফট (Overdraft) হয় এবং চেক ইস্যুকারী প্রাপক Benificiary-এর নিকট ঋণী হয় এমতাবস্থায় ঋণদাতা উক্ত চেক ব্যাংকের নিকট পেশ করে যাতে সে নিজের টাকা উসুল করতে পারে। এই পদ্ধতিটাও হাওয়ালা কিন্তু এতে যার ওপর হাওয়ালা করা হচ্ছে সে হাওয়ালাকারী ঋণগ্রহীতা নয় বিধায় এটাকে ফুকাহায়ে কেরামের পরিভাষায় حوالـه على البرى বলা হয় এটাও শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ। ব্যাংক যদি চেক গ্রহণ করে, বোঝা যাবে ব্যাংক উক্ত হাওয়ালা গ্রহণ করেছে। এমতাবস্থায় ব্যাংকের জিম্মায় যাকে হাওয়ালা করা হয়েছে হাওয়ালাকৃত টাকা আদায় করা ওয়াজিব হবে, যা হাওয়ালাকারীর জিম্মায় ওয়াজিব ছিল এবং হাওয়ালাকারী ব্যাংকের নিকট ঋণী হয়ে যাবে।

উপরোক্ত বক্তব্যের সারসংক্ষেপ :

(১) যদি চেক ইস্যুকারীর ব্যাংকে ব্যালেন্স থাকে এবং সে নিজে নিজের জন্য ব্যাংক থেকে চেকের মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করে তাহলে সেটা হবে কেবল

ঋণ প্রাপ্তি।

(২) এমতাবস্থায় সে যদি অন্য কারো নামে চেক ইস্যু করে এবং সে ইস্যুকারীর ঋণদাতা হয় তাহলে এটা হবে তার ঋণদাতাকে নিজের ঋণগ্রহীতা ব্যাংকের নিকট হাওয়ালা।

(৩) যদি চেক ইস্যুকারীর অ্যাকাউন্টে ব্যালেন্স না থাকে এবং ইস্যুকারী নিজের জন্য ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন করে তাহলে এটা হবে করজের লেনদেন। ব্যাংক ঋণদাতা এবং চেক ইস্যুকারী ঋণগ্রহীতা।

(৪) এমতাবস্থায় চেক ইস্যুকারী অন্য কারো নামে চেক লিখে দিলে যে তার জন্য ঋণদাতা তাহলে সেটাও হাওয়ালা হবে।

শরীয়া স্টান্ডার্ডে চেকের শরয়ী বিধানসংক্রান্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ :

১. চলতি হিসাবের বিপরীতে চেক ইস্যু করা হাওয়ালা। এমতাবস্থায় প্রাপক যদি ঋণদাতা হয় তাহলে চেক ইস্যুকারী হাওয়ালাকারী। ব্যাংক মুহাল আলাইহি অর্থাৎ যার নিকট হাওয়ালা করা হয়েছে এবং প্রাপক মুহাল অর্থাৎ যাকে হাওয়ালা করা হয়েছে।

২. চেক ইস্যুকারী যদি প্রাপকের ঋণগ্রহীতা না হয় তাহলে এটা হাওয়ালা নয়। কেননা ঋণ ছাড়া হাওয়ালা হয় না। বরং এটা হবে ওয়াকালা বিল কবজ বা কবজ করার জন্য উকিল বানানো, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ।

৩. যদি চেক ইস্যুকারী প্রাপকের ঋণগ্রহীতা হয় এবং ব্যাংকে ইস্যুকারীর ব্যালেন্স না থাকে এমতাবস্থায় ব্যাংক উক্ত চেক গ্রহণ করলে সেটা হবে হাওয়ালা মুতলাকা বা শর্তহীন হাওয়ালা। পক্ষান্তরে ব্যাংক যদি উক্ত চেক গ্রহণ না করে তাহলে এটা হাওয়ালা হবে না। এমতাবস্থায় চেকের বাহক ইস্যুকারীর নিকট রুজু করা বৈধ।

৪. ভ্রমণ চেকের বাহক, যিনি চেকের মূল্য প্রতিষ্ঠানকে আদায় করেন। বাহককে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ঋণদাতা গণ্য করা হবে। যদি বাহক উক্ত চেক নিজের ঋণদাতার নামে এন্ডোর্স করে তাহলে এটা হাওয়ালা হয়ে যাবে। এটা হবে হাওয়ালা মুকাইয়াদা শর্তযুক্ত হাওয়ালা।

মুফতী মুহাম্মদ তকী উসমানী দা. বা. তাকমালায়ে ফতুহুল মুলহিমে চেক এবং এর বিধান সম্পর্কে লিখেন–

فالصحيح ان الشيك المصر فى سند يدل على ان الذى وقع عليه قد وكل حامله لقبض دينه من البنك ومقاصة دينه منه فليس ذلك من الاثمان فى شئ فلا يعتبر القبض عليه قبضا على مبلغه حتى ينقده البنك ولا يتادى بادائه الزكوٰة حتى ينقده الفقير ولا يجوز اشتراء الذهب والفضة به لفقدان التقابض فى المجلس ويجوز لموقعه ان يعزل حامله عن الوكالة قبل ان يبلغ به الى البنك۔ (تكملة فتح الملهم ১/৫১০)

অর্থাৎ সহীহ হলো ব্যাংক চেক একটা ডকুমেন্ট, যা এ কথার প্রমাণ বহন করে যে যিনি এর ওপর স্বাক্ষর করেছেন তিনি বাহককে উকিল বানাচ্ছেন যাতে সে তার ঋণ ওখান থেকে উসুল করে অতঃপর কাটাকাটি অর্থাৎ ক্লিয়ারিং হয়ে যাবে। সুতরাং চেক ছমন নয় তাই চেকের ওপর কবজ করাকে চেকে উল্লিখিত টাকার ওপর কবজ ধরা হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত টাকা ক্যাশ করা হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত ভিক্ষুক সেই চেক ক্যাশ করাবে না ততক্ষণ পর্যন্ত উক্ত চেক দ্বারা জাকাত আদায় হবে না। সাথে সাথে চেক দ্বারা স্বর্ণ-রৌপ্যের, ক্রয়-বিক্রয়ও জায়েয নেই। কেননা এর মাধ্যমে চুক্তির মজলিশে ক্রেতা-বিক্রেতা বিনিময়দ্বয়ের ওপর কবজ করার শর্ত অনুপস্থিত। চেকে স্বাক্ষরকারীর জন্য তার বাহককে ব্যাংকে পৌঁছার পূর্বে ওয়াকালত থেকে বরখাস্ত করাও বৈধ।

উল্লেখ্য :

ওপরে উল্লিখিত আল ব্যাংক আল লা রিবাভী এবং শরীয়া স্টান্ডার্ডের বক্তব্যের আলোকে বলা যায় যে কিছু কিছু অবস্থায় চেকের লেনদেন হাওয়ালার অন্তর্ভুক্ত হয় তাই চেকের মধ্যে হাওয়ালাকে একচেটিয়া না বলা বাহ্যিকভাবে যথার্থ নয় এবং সেটাকে সর্বাবস্থায় রসিদ সাব্যস্ত করা এবং উক্ত লেনদেনকে ওয়াকালা সাব্যস্ত করা প্রশ্নবিদ্ধ। তাকমালার বক্তব্যে চেক দ্বারা স্বর্ণ-রৌপ্যের লেনদেন নাজায়েয হওয়া সম্ভবত কেবল ওই সময়ে যখন ক্রয়-বিক্রয় মজলিশে স্বর্ণ-রৌপ্যের ওপর কবজ হবে না তখন। যদি চুক্তির মজলিশে স্বর্ণ-রৌপ্যের ওপর কবজ করা হয় তাহলে উক্ত লেনদেন বৈধ হওয়া চাই। কেননা চেকের মধ্যে উল্লেখকৃত মুদ্রা নিশ্চয় কোনো না কোনো দেশের কারেন্সি। কারেন্সি নোট দ্বারা স্বর্ণ-রৌপ্যের লেনদেন বাকিতে বৈধ। যেহেতু এটা বাঈ সরফের অন্তর্ভুক্ত নয়।

হস্তান্তরযোগ্য বিল-হুন্ডি (Bill of Exchange) :

হস্তান্তরযোগ্য বিল (হুন্ডি)-এর বাস্তবতা ও সংজ্ঞা :

এ বিষয়ে মুফতী মুহাম্মদ তকী উসমানী দা. বা. তাঁর প্রসিদ্ধ উর্দু পুস্তিকা ইসলাম আওর জদীদ মাঈশত ওয়া তিজারতে লেখেন। হস্তান্তরযোগ্য বিল (হুন্ডি) (Bill of Exechange) একটা বিশেষ প্রকারের ডকুমেন্ট। যখন কোনো ব্যবসায়ী নিজের মাল বিক্রি করে তখন ক্রেতার নামে একটা বিল তৈরি করে। অনেক সময় উক্ত বিলের পরিশোধ পরবর্তীতে কোনো নির্ধারিত সময়ে ওয়াজিব হয়। উক্ত বিলকে ডকুমেন্টে রূপান্তরিত করার জন্য ঋণগ্রহীতা তা মঞ্জুর করে এর ওপর স্বাক্ষর করে দেয় এই মর্মে যে আমার জিম্মায় অমুক তারিখ উক্ত বিল আদায় করা ওয়াজিব।

এ ধরনের বিলকে আরবীতে كمبيالہ এবং উর্দুতে ہنڈی ইংরেজিতে Bill of Exchange বলা হয়। এটাকে হস্তান্তরযোগ্য বিলও বলা হয়। উক্ত ডকুমেন্টে বিল পরিশোধের যেই তারিখ উল্লেখ থাকে উক্ত তারিখ আসাকে আরবীতে نضج الكمبيالہ এবং ইংরেজিতে Maturity বলা হয় এবং উক্ত পরিশোধের তারিখকে Maturity Date বলা হয়। উক্ত বিলে উল্লেখকৃত টাকা ঋণগ্রহীতা থেকে বিল পরিশোধের নির্দিষ্ট তারিখ আসলেই নেওয়া যায়। তবে ঋণদাতার তাৎক্ষণিক টাকার প্রয়োজন হলে উক্ত বিল অন্য কাউকে দিয়ে বিলে উল্লেখকৃত টাকা নিয়ে নেয় এবং বিলের অপর পৃষ্ঠে স্বাক্ষর করে উক্ত বিলের পাওনা তৃতীয় ব্যক্তির দিকে স্থানান্তর করে দেয়। তৃতীয় ব্যক্তি উক্ত বিলে উল্লেখকৃত টাকার মধ্যে বাট্টাও করে যথা হস্তান্তরযোগ্য বিলে এক হাজার টাকা লিখিত আছে এমতাবস্থায় তৃতীয় ব্যক্তি এক হাজার টাকার পরিবর্তে ৯৫০ টাকা আদায় করে। এ ধরনের প্রক্রিয়াকে আরবী ভাষায় خصم الكمبيالہ এবং ইংরেজিতে Discounting of the Bill of Exchange এবং (বাট্টাকরণ) বলা হয়। হস্তান্তরযোগ্য বিলের অপর পৃষ্ঠে যেই স্বাক্ষর করা হয় তাকে আরবীতে تظهير এবং ইংরেজিতে Endorsement বলা হয়। হুন্ডির ওপর বাট্টার পরিমাণ Maturity কে সামনে রেখে নির্ধারণ করা হয়। বিল পরিশোধের সময় যত ঘনিয়ে আসবে বাট্টার পরিমাণ তত কম হবে। ব্যাংক ও সাধারণত হস্তান্তযোগ্য বিলের ডিসকাউন্টিং করে এবং এটাও ব্যাংকের স্বল্প মেয়াদি ঋণসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কেননা বিল পরিশোধের Maturity সাধারণত তিন মাস হয়। (اسلام اور جديد معيشت وتجارت ١٢٢)

মাওলানা দা. বা একই বক্তব্য তাঁর প্রসিদ্ধ আরবী কিতাব بحوث এর মধ্যে এভাবে উল্লেখ করেছেন।

النوع الثانى من الاوراق المالية التى تتداول فى السوق اليوم تسمى كمبيالة وهى عبارة عن الوثيقة التى يكتبها المشترى للبائع فى بيع موجل ويعترف فيها بانه وجب فى ذمته ثمن المبيع ، وانه يلتزم باداء فى تاريخ آجل، وان البائع حامل الكمبيالة ربما يريد استعجال الحصول على مبلغها فلا ينتظر الى تاريخ نضج المبيالة بل يبيعها الى طرف ثالث باقل من قيمتها الاسمية ويسمى حسم الكمبيالة او خصم الكمبيالة Discounting والعادة فى سوق الاوراق ان مقدار هذا الحسم نسبة مبلغ الكمبيالة تحدد على اساس مدة نضجها فكلما كانت مدة نضجها اكثر كانت نسبة الحسم اكثر وكلما كانت المدة اقل كانت نسبة الحسم اقل۔ (بحوث فى قضايا فقية معاصرة ١١٢/٢)

ড. আব্দুল আজিজ ফাহমী হাইকল হস্তান্তর যোগ্য বিলের সংজ্ঞায় লেখেন–

هى نوع من السندات الاذنية التى تستخدم فى التجارة الخارجية فى الدول الغربية يتعهد بموجبها الساحب The Drawer وبدون شروط ان يدفع للمسحوب لصالحه The Drawee مبلغا من المال فى تاريخ معين (موسوعة المصطلحات الاقتصادية الاحصائية ٧٥)

অর্থাৎ, হস্তান্তরযোগ্য বিল ওই সব ডকুমেন্টের অন্তর্ভুক্ত, যা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পশ্চিমা দেশে ব্যবহার হয়। এর মাধ্যমে স্বাক্ষরকারী বিনা শর্তে প্রাপককে নির্দিষ্ট তারিখে মালের বিশেষ একটা পরিমাণ আদায় করার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

ড. আগার ওয়াল হস্তান্তরযোগ্য বিলের সংজ্ঞায় লেখেন–

A bill of Exchange is an order from a creditor to the debtor to pay a certain sum of money to himself to the bearer. (Intrudaction to Economic Principles)

অর্থাৎ, হস্তান্তরযোগ্য বিল ঋণদাতার পক্ষ থেকে ঋণগ্রহীতার জন্য একটি নির্দেশনামা। ঋণগ্রহীতা, ঋণদাতাকে অথবা বাহককে টাকার নির্দিষ্ট পরিমাণ আদায় করবে।

১৮৮২ সালে ইংরেজিতে জারীকৃত বিল অব এক্সচেঞ্জ অ্যাক্টে এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে–

An unconditional order in writing addressed by one person to another singed by the person giving it, requiring the person to whom it is addressed to pay on demand or at a fixed or determinable future time a sum certain in money or to the order of a specefied person, or to bearer.

অর্থাৎ, হস্তান্তরযোগ্য বিল একটি শর্তহীন লিখিত হুকুমনামা, যা হুকুমদাতা ব্যক্তি বা পক্ষের স্বাক্ষরে কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তি বা পক্ষের নামে ইস্যু করা হয়। যাতে একটি নির্দিষ্ট টাকার পরিমাণ এতে উল্লেখকৃত ব্যক্তি বা এর হুকুমে অন্য কাউকে বা বিলের বাহককে এর চাহিদার ওপর অথবা ভবিষ্যৎ কোনো নির্দিষ্ট তারিখে অথবা কোনো নির্ধারণযোগ্য তারিখে পরিশোধের জন্য বলা হয়ে থাকে। (بحوالۂ تعارف زروبينكارى شيخ مبارك على ٢٣٤)

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার-২০

মুফতী ইজহারুল ইসলাম আলকাওসারী

শেষ কথা

আমরা এখানে সর্বশেষ বিষয় হিসেবে অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশনের (ওআইসি) জেদ্দাস্থ ইসলামিক ফিকহ একাডেমী কর্তৃক গৃহীত একটি সিদ্ধান্ত উল্লেখ করব। এ বিষয়ে এটিই আমাদের চূড়ান্ত বক্তব্য, বরং এটি বর্তমানে প্রত্যেক মুসলমানের মনে রাখা কর্তব্য–

إن اختلاف المذاهب الفكرية، القائم في البلاد الإسلامية نوعان :

(أ) اختلاف في المذاهب الاعتقادية .

(ب) واختلاف في المذاهب الفقهية .

فأما الأول، وهو الاختلاف الاعتقادى، فهو في الواقع مصيبة، جَّرت إلى كوارث في البلاد الإسلامية، وشقت صفوف المسلمين، وفرقت كلمتهم، وهي مما يؤسف له، ويجب أن لا يكون، وأن تجتمع الأمة على مذهب أهل السنة والجماعة، الذى يمثل الفكر الإسلامى، النقى السليم فى عهد الرسول وعهد الخلافة الراشدة التى أعلن الرسول أنها امتداد لسنته بقوله : عليكم بسنتى، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ.

এক.

মুসলিম উম্মাহের মাঝে প্রচলিত বুদ্ধিবৃত্তিক মতপার্থক্য দুই ধরনের–

১. আক্বীদা-বিশ্বাসসংক্রান্ত মতবিরোধ।

২.বিধি-বিধান তথা শাখাগত মাসআলা-মাসায়েলসংক্রান্ত মতবিরোধ।

প্রথমোক্ত বিষয় তথা আক্বীদা-বিশ্বাসসংক্রান্ত মতবিরোধ মুসলিম উম্মাহের জন্য প্রকৃতপক্ষে একটি মহাবিপদ, যা মুসলিম বিশ্বকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এটি মুসলিম উম্মাহের ঐক্য, সংহতি ও সম্প্রীতি বিনষ্ট করেছে এবং মুসলিম উম্মাহকে বহুধাবিভক্ত করেছে। এটি একটি দুঃখজনক এবং যারপরনাই অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়। এ বিষয়ে মতবিরোধ না হওয়া আবশ্যক।

সমগ্র মুসলিম উম্মাহ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বীদা বিশ্বাসের ওপর অটল-অবিচল থাকবে, যা নববী যুগ এবং খেলাফতে-রাশেদার যুগের নিখুঁত ও পরিচ্ছন্ন ইমলামী চিন্তার প্রতিচ্ছবি। খেলাফতে রাশেদার সুন্নাহ মূলত রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ। এ ব্যাপারে স্বয়ং রাসূল (সা.)-এর সুস্পষ্ট ঘোষণা–

"তোমরা আমার সুন্নাহ এবং আমার পরে খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরো এবং মাড়ির দাঁত দিয়ে শক্তভাবে ধরার মতো তা আঁকড়ে ধরো।

وأما الثانى، وهو اختلاف المذاهب الفقهية، فى بعض المسائل، فله أسباب علمية، اقتضته، ولله -سبحانه -فى ذلك حكمة بالغة :ومنها الرحمة بعباده، وتوسيع مجال استنباط الأحكام من النصوص، ثم هى بعد ذلك نعمة، وثروة فقهية تشريعية، تجعل الأمة الإسلامية فى سعة من أمر دينها وشريعتها، فلا تنحصر فى تطبيق شرعى واحد حصرا لا مناص لها منه إلى غيره، بل إذا ضاق بالأمة مذهب أحد الأئمة الفقهاء فى وقت ما، أو فى أمر ما، وجدت فى المذهب الآخر سعة ورفقا ويسرا، سواء أكان ذلك فى شئون العبادة، أم فى المعاملات، وشئون الأسرة، والقضاء والجنايات، على ضوء الأدلة الشرعية .

দুই.

দ্বিতীয় বিষয় হলো, শাখাগত মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে ফিকহী মাযহাবসমূহের মাঝে মতপার্থক্য, যার অনেক যুক্তিগ্রাহ্য ও শাস্ত্রীয় কারণ রয়েছে। এ বিষয়ে মতপার্থক্যের মাঝে আল্লাহর নিগূঢ় তাৎপর্য ও রহস্য নিহিত আছে। যেমন বান্দার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করা এবং শরীয়তের উৎস থেকে বিধি-বিধানসমূহ আহরণ করার ক্ষেত্রকে প্রশস্ত করা। তা ছাড়া এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট নেয়ামত এবং প্রয়োগিক ফিকহ ও আইন শাস্ত্রের মূল্যবান সম্পদ, যা মুসলিম উম্মাহকে দ্বীন ও শরীয়তের ক্ষেত্রে প্রশস্ততা প্রদান করেছে। ফলে সেটি নির্ধারিত একটি শরয়ী হুকুমের আওতায় সীমাবদ্ধ থাকবে না, যা থেকে কোনো অবস্থাতেই বের হওয়ার সুযোগ নেই বরং যেকোনো সময়ে কোনো ইমামের কোনো মাযহাব যদি সংকীর্ণতার কারণ হয়, তবে দলিলের আলোকে অন্য ইমামের মাযহাবে সহজতা ও প্রশস্ততা পাওয়া যাবে; তা হতে পারে, ইবাদত, মুআমালা, পরিবার, বিচার কিংবা অপরাধসংক্রান্ত।

فهذا النوع الثانى من اختلاف المذاهب، وهو الاختلاف الفقهى، ليس نقيصة، ولا تناقضاً فى ديننا، ولا يمكن أن لا يكون، فلا يوجد أمة فيها نظام تشريعى كامل بفقهه واجتهاده ليس فيها هذا الاختلاف الفقهى الاجتهادى فالواقع أن هذا الاختلاف، لا يمكن أن لا يكون، لأن النصوص الأصلية، كثيرا ما تحتمل أكثر من معنى واحد، كما أن النص لا يمكن أن

المذاهب الفقهية القائمة، وفى أئمتها أو بعضهم، ففى بياننا الآنف عن المذاهب الفقهية، ومزايا وجودها وأئمتها ما يوجب عليهم أن يكفوا عن هذا الأسلوب البغيض الذى ينتهجونه، ويضللون به الناس، ويشقون صفوفهم، ويفرقون كلمتهم فى وقت نحن أحوج ما نكون إلى جمع الكلمة فى مواجهة التحديات الخطيرة من أعداء الإسلام، بدلا من هذه الدعوة المفرّقة التى لا حاجة إليها .وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ، والحمد لله رب العالمين

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, কিছু মুসলমান তরুণ, বিশেষত যারা বাইরে লেখাপড়া করতে যায় তাদের ইসলামী জ্ঞানের দুর্বলতার সুযোগে কিছু 'গোমরাহকারী' লোক তাদের সামনে ফিকহী মাসআলার এ-জাতীয় মতপার্থক্যকে আক্বীদার মতভেদের মতো করে তুলে ধরে; অথচ এ দুয়ের মাঝে রয়েছে আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

দ্বিতীয়ত যে শ্রেণীর লোকেরা মানুষকে মাযহাব বর্জন করার আহবান করে এবং ফিকহের মাযহাব ও তার ইমামগণের সমালোচনা করে মানুষকে নতুন ইজতেহাদ ও মাযহাবের মাঝে আনতে চায়, তাদের কর্তব্য হলো, এই নিকৃষ্ট পন্থা পরিহার করা। এর মাধ্যমে মূলত তারা মানুষকে পথভ্রষ্ট করছে এবং মুসলিম উম্মাহের ঐক্যকে বিনষ্ট করছে। অথচ এখন প্রয়োজন এ-জাতীয় বিচ্ছিন্নতা ও গোমরাহীর পথ পরিহার করে ইসলামের শত্রুদের ভয়াবহ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় নিজেদের ঐক্যকে সুদৃঢ় ও অটুট করা।

(সমাপ্ত)

অতএব, কিয়াসের আশ্রয় নিয়ে হুকুমের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং শরীয়তের মৌলিক উদ্দেশ্যের আলোকে সেগুলোর সমাধানের পথে অগ্রসর হতে হবে এবং উদ্ভাবিত সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে প্রয়াসী হতে হবে।

এ ক্ষেত্রেই মূলত উলামায়ে কেরামের বুঝ ও চিন্তার বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় এবং সম্ভাব্য বিষয়সমূহের কোনো একটিকে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের মতভিন্নতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে একই বিষয়ে বিভিন্ন সমাধান আসে; অথচ প্রত্যেকের উদ্দেশ্য থাকে হক্ব ও সত্যের অনুসন্ধান। অতএব, এ ক্ষেত্রে যার ইজতেহাদ সঠিক হবে সে দুটি সাওয়াবের অধিকারী হবে এবং যার ইজতেহাদ ভুল হবে, সে একটি সাওয়াবের অধিকারী হবে। আর এভাবেই শরীয়তের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে সংকীর্ণতা দূর হয়ে প্রশস্ততা সৃষ্টি হয়।

সুতরাং যে মতপার্থক্য কল্যাণ ও রহমতের মাধ্যম, সেটি দোষের কারণ হবে কেন? বরং এটি তো আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি রহমত ও অনুগ্রহ, যা মুসলিম উম্মাহের জন্য গর্ব ও গৌরবের বিষয়।

ولكن المضللين من الأجانب، الذين يستغلون ضعف الثقافة الإسلامية لدى بعض الشباب المسلم، ولا سيما الذين يدرسون لديهم فى الخارج، فيصورون لهم اختلاف المذاهب الفقهية هذا كما لو كان اختلافا اعتقاديا، ليوحوا إليهم ظلما وزوراً بأنه يدل على تناقض الشريعة، دون أن ينتبهوا إلى الفرق بين النوعين وشتان ما بينهما .ثانيا :وأما تلك الفئة الأخرى، التى تدعو إلى نبذ المذاهب، وتريد أن تحمل الناس على خط اجتهادى جديد لها، وتطعن فى يستوعب جميع الوقائع المحتملة، لأن النصوص محدودة، والوقائع غير محدودة، كما قال جماعة من العلماء - رحمهم الله تعالى -فلا بد من اللجوء إلى القياس، والنظر إلى علل الأحكام، وغرض الشارع، والمقاصد العامة للشريعة، وتحكيمها فى الوقائع، والنوازل المستجدة .وفى هذا تختلف فهوم العلماء ، وترجيحاتهم بين الاحتمالات، فتختلف أحكامهم فى الموضوع الواحد، وكل منهم يقصد الحق، ويبحث عنه، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد، ومن هنا تنشأ السعة ويزول الحرج .فأين النقيصة فى وجود هذا الاختلاف المذهبى، الذى أوضحنا ما فيه من الخير والرحمة، وأنه فى الواقع نعمة، ورحمة من الله بعباده المؤمنين، وهو فى الوقت ذاته، ثروة تشريعية عظمى، ومزية جديرة بأن تتباهى بها الأمة الإسلامية .

অতএব, আহকাম ও বিধানের ক্ষেত্রে এ ধরনের মাযহাবী মতপার্থক্য আমাদের দ্বীনের জন্য দোষের কিছু নয় এবং তা স্ববিরোধীতাও নয়। এ ধরনের মতভেদ অবশ্যম্ভাবী। এমন কোনো জাতি পাওয়া যাবে না, যাদের আইনব্যবস্থায় এ ধরনের ইজতেহাদী মতপার্থক্য নেই।

অতএব, বাস্তব সত্য হলো, এ ধরনের মতভেদ না হওয়া অসম্ভব। কেননা একদিকে যেমন শরীয়তের উৎসসমূহ (নুসুস) বিবিধ অর্থের সম্ভাবনা রাখে, অন্যদিকে সকল সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে শরীয়তের সুস্পষ্ট নির্দেশনা (নস) পাওয়া যায় না। কেননা শরীয়তের নির্দেশনা (নস) সীমাবদ্ধ, কিন্তু নিত্যনতুন সমস্যার কোনো সীমারেখা নেই।

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : কবর

মুহা. সুহেল হাশিম খান
জোয়ার সাহারা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আজ থেকে ৪০ বছর পূর্বে আমাদের ঘরের পাশে মোবারক আলী মোল্লার বাবা-মা এবং তার মেয়ে আফসানার–এই তিনজনের কবর বিদ্যমান আছে। বর্তমানে আমরা একটি পারিবারিক কবরস্থান করেছি। তাই আমাদের ইচ্ছা হলো, ওই কবরগুলো পারিবারিক কবরস্থানে স্থানান্তর করা। ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুসারে ওই কবরগুলো স্থানান্তর করা যাবে কি না তার সঠিক সমাধান জানতে চাই।

সমাধান :

ইসলামী শরীয়তে কবর স্থানান্তরের অনুমতি নেই। তবে ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে অবস্থিত কবর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে লাশ মাটিতে মিশে যাওয়ার প্রবল ধারণা হলে কবরের চিহ্ন মুছে ফেলে উক্ত জায়গা অন্য কাজে ব্যবহার করতে পারবে। (আদ্দুররুল মুখতার আলা সদরি রাদ্দুল মুহতার-১/১৩৮, খুলাসাতুল ফাতাওয়া-১/১১৯, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া-১৫/৩২১)

প্রসঙ্গ : ক্রয়-বিক্রয়

মুহা. শামছুদ্দীন
ফিকাহ প্রথম বর্ষ

জিজ্ঞাসা :

এক ব্যক্তির কিছু টাকা ঋণ নেওয়ার প্রয়োজন হলে সে এক সমিতির দ্বারস্থ হয়। সমিতি কর্তৃপক্ষ তাকে টাকা না দিয়ে, কিছু মোবাইল কার্ড অতিরিক্ত মূল্যে তার কাছে বিক্রি করে দেয় মোবাইল কার্ডগুলো নিয়ে সে অন্য এক সমিতির কাছে বিক্রয় করে নগদ টাকা লাভ করে। উল্লেখ্য, উভয় সমিতির মাঝে এ ধরনের লেনদেনের প্রচলন হয়ে আছে। অর্থাৎ একজনের কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করে অন্যজনের কাছে বিক্রি করা হয়–শরীয়তের দৃষ্টিতে এমন লেনদেন বৈধ হবে কি না?

সমাধান :

প্রশ্নে বর্ণিত সমিতি কর্তৃপক্ষের এ ধরনের লেনদেন শরীয়তসম্মত নয়। (রদ্দুল মুখতার-৫/৩২৫, আল মা'আয়িরুশ শরইয়া-৪১৬, শরহে মুল্লা মিসকিন-২/১৮)

প্রসঙ্গ : মিলাদ

সেক্রেটারি
মহাখালী জামে মসজিদ
টিভি গেট, বনানী, ঢাকা-১২১৩।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের মসজিদ কবরস্থানসংলগ্ন। আমাদের মধ্যে অনেকেই মিলাদের জন্য মিষ্টি নিয়ে আসে। মুয়াজ্জিন সাহেব কিংবা ইমাম সাহেব এলান করেন সময় থাকলে আমরা যেন বসি মিলাদের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাদের প্রশ্ন–

১) মিলাদ সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কী?

২) মিলাদ পড়ানোর নিয়ম কী?

সমাধান :

প্রকৃত মিলাদ তথা রাসূল (সা.)-এর জন্ম-বৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা করা মুমীনদের জন্য বড় পুণ্যের কাজ, অনুরূপভাবে রাসূল (সা.)-এর ওপর দরূদ পাঠ করা অত্যন্ত ফজীলতপূর্ণ ইবাদত তবে এর জন্য শরীয়ত কর্তৃক কোনো সময় ও পদ্ধতি নির্ধারিত নেই। বর্তমান যুগে প্রচলিত মিলাদ-কিয়ামের পদ্ধতি ইসলামের সোনালি যুগ তথা রাসূল (সা.), সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও তাবেতাবেঈনগণের যুগে পাওয়া যায়নি বিধায় প্রচলিত পদ্ধতিতে মিলাদ, কিয়াম করা শরীয়তসম্মত নয়। অতএব তা বর্জনীয়। (শরহে বুখারী-২/৪০৬, ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়া-১১৪)

প্রসঙ্গ : নামায

এম এম কামরুজ্জামান
তেজকুনিপাড়া, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

সুরত-১ : প্রথম দিন তারাবীহ (দুই রাক'আতওয়ালা নামায)-এর প্রথম রাক'আতে উভয় সিজদা শেষে দাঁড়ানোর পূর্বে ইমাম সাহেব বসে পড়েছেন এবং মুক্তাদিদের লোকমা শুনে দাঁড়িয়ে গিয়েছেন এরপর দ্বিতীয় রাক'আত শেষে একদিকে সালাম ফিরিয়ে সিজদায়ে সাহু করে নামায শেষ করেছেন।

সুরত-২ : দ্বিতীয় দিন এশার নামাযে তৃতীয় রাক'আতে উভয় সিজদা শেষে দাঁড়ানোর পূর্বে ইমাম সাহেব বসে পড়েছেন এবং মুক্তাদির লোকমা শুনে দাঁড়িয়ে গিয়েছেন এরপর চার রাক'আত পূর্ণ করে উভয় দিকে সালাম ফেরানোর সময় একজন মুক্তাদি সিজদায়ে সাহুর জন্য লোকমা দিলেও ইমাম সাহেব সিজদায়ে সাহু ইচ্ছাকৃতভাবে করেননি। (উভয় নামাযের মধ্যেই আনুমানিক তিন তাসবীহ পরিমাণ বসেছেন। তারপর লোকমা দেওয়া হয়েছে) প্রশ্ন–উপরোক্ত দুটি নামায সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম কী?

সমাধান :

প্রশ্নে বর্ণিত উভয় নামাযে তিন তাসবীহ পরিমাণ সময় বসার দরুন সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়েছে। তাই তারাবীহের নামাযে ইমাম সাহেব সাহু সিজদা আদায় করার কারণে নামায সহীহ হয়েছে এবং এশার নামাযে সাহু সিজদা ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও তা না করার কারণে উক্ত নামাযকে পুনরায় পড়া ওয়াজিব। (সুনানে আবু দাউদ-১/১৪৯, রদ্দুল মুহতার-১/৪৬৯, আল মুহিতুল বুরহানী-২/৩১৫)

প্রসঙ্গ : তালাক

মুহা. ওয়াজেদ আলী
গাজীপুর।

জিজ্ঞাসা :

গত ১০/০৫/২০১৫ ইং তারিখে আমার প্রথম স্ত্রীর পক্ষের কিছু আত্মীয়স্বজন আমাকে ফোনে ডেকে নিয়ে যায়। যাওয়ার পর তারা আমাকে সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১টা পর্যন্ত একটি রুমে আটকে বল প্রয়োগ করে, অর্থাৎ (কাজি সাহেবের লোকের একটি লিখিত কাগজ নিয়ে তারা এ কথা বলে যে আপনি এই কাগজে সই করেন, ফাজলামি করেন? ছাগলামি করেন? দুই বিয়া করেন তালাক দেন এখানে সই করেন। সই না করে এখান থেকে যেতে পারবেন না। সই না করলে মেরে লম্বা করে ফেলব। সই করতেই হবে, তালাক দিতেই হবে–এ ছাড়া কোনো উপায় নেই। এই কথাগুলো তারা বারবার বলতে থাকে এবং এভাবে রাত ১টা পর্যন্ত বলে। অতঃপর আমি নিরুপায় হয়ে এবং শুধুমাত্র আত্মরক্ষার্থে কোনো ধরনের তালাকের নিয়্যাত ছাড়াই কাজির পাঠানো কাগজে সই করি এবং তাদের থেকে মুক্ত হই। এটা ব্যতীত আমি মুখে বা ফোনে কোনো ধরনের তালাক উচ্চারণ করিনি। এর দুই দিন পর আমি পুনরায় আমার দ্বিতীয় স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-সংসার করতে থাকি এদিকে কাজি সাহেব সইসহ লিখিত কাগজটি আমার স্ত্রীর নিকট পাঠিয়ে দেন। তাতে শুধু তালাক শব্দ লেখা আছে। তালাকের কোনো সংখ্যা উল্লেখ নেই। এখন মুফতী সাহেব হুজুরের নিকট আমার জানার বিষয় হলো–

১। এমন কাজের জন্য কি আমার দ্বিতীয় স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে?

২। আমার ঘর-সংসার করা বৈধ আছে কি? বা এখন আমার করণীয় কী?

৩। এ রকমের বল প্রয়োগের শরয়ী হুকুম কী?

সমাধান :

তালাক মুখে উচ্চারণ করা ছাড়া শুধুমাত্র তালাকের কাগজে জোরপূর্বক দস্তখত আদায়ের বিবরণ সত্য হয়ে থাকলে আপনার দ্বিতীয় স্ত্রীর ওপর কোনো তালাক পতিত হবে না। আপনাদের পরস্পর ঘর-সংসার করা বৈধ আছে। শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া এ ধরনের বল প্রয়োগ করা জুলুম ও গোনাহের কাজ। (রদ্দুল মুহতার-২/২৩৬, আল-বাহরুর রায়েক-৩/২৪৬, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম-৯/১৪৮)

প্রসঙ্গ : তালাক

মুছা. জাকিয়া আক্তার
ময়মনসিংহ।

জিজ্ঞাসা :

গত ১৩/০২/২০১৫ ইং আমার মা হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর তাঁকে আমার বড় ভাইয়ের নিকট ঢাকা সিএমইচে ভর্তি করানো হয়। আমি বড় ভাইয়ের বাসায় থাকি এবং হসপিটালে গিয়ে তাঁর সেবা-যত্ন করতে থাকি। এমতাবস্থায় আমার স্বামী মুহা. মোজ্জামেল হোসেন মাঝে মাঝে হসপিটালে আসা-যাওয়া করেন এবং আমাকে চলে যেতে বলেন। আমি তাঁকে মায়ের করুণ অবস্থা সম্পর্কে অবগত করি; কিন্তু তিনি বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিয়ে আমাকে চলে যেতেই বলেন। আমার স্বামী ঢাকার লালমাটিয়ায় একটি মাদরাসায় হেফজখানার শিক্ষক। একদিন আমাকে মোবাইল করে বলেন, আমার মাদরাসা ছুটি হবে তুই রেডি থাকবি, তোকে বাড়ি নিয়ে যাব। কিন্তু মাদরাসা ছুটি হওয়ার পর তিনি একা একা গোপনে বাড়ি চলে যান। উনার ভাষাগত দিক আমার কাছে যথেষ্ট আপত্তিকর ছিল। আমার ফ্যামিলি সম্পর্কে অনেক সময় এমন বাজে মন্তব্য করতেন, যা আমার জন্য খুবই কষ্টকর ছিল। গত ২৩/০৩/২০১৫ ইং তারিখে মোবাইল ফোনে বিভিন্ন কথাকাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে রাগের মাথায় আমাকে বলেন যে তোকে আমি ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী তালাক প্রদান করছি। এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক; কিন্তু পরবর্তীতে বিষয়টি লিখিতভাবে দেন, যা নিম্নরূপ : আমি আমার স্ত্রীর সাথে মোবাইলের মাধ্যমে কথা বলার একপর্যায়ে তাকে সংশোধন করার ইচ্ছায় এক তালা, দুই তালা, তিন তালা বলেছি। আমার স্ত্রী আমার কথাকে তাকে তিন তালাক দিয়েছি বলে বুঝে নিয়েছে।

আমার শোনার মধ্যে যেহেতু কোনো ধরনের অস্পষ্টতা ছিল না বরং নিজ কানে স্পষ্টভাবে তালাক প্রদানের বিষয়টি শুনেছি তাই আমি এই বিবরণটি কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছি না। বরং তা আমার কাছে ফাঁকিবাজি ও মিথ্যা হিসেবে গণ্য। আশা করি, বর্তমানে আমাকে এ ব্যাপারে শরীয়তের সঠিক সমাধান দিয়ে কৃতজ্ঞ করবেন।

সমাধান :

শরীয়তের দৃষ্টিতে স্বামী-স্ত্রী ঝগড়ার সময় তালাক শব্দের স্থলে 'তালা' শব্দের উচ্চারণের দ্বারাও তালাক পতিত হয়। যদিও তা ভয় দেখানো বা সংশোধনের উদ্দেশ্যে বলা হোক না কেন। অতএব আপনার স্বামীপ্রদত্ত তিন তালাক

আপনার ওপর পতিত হয়ে আপনাদের বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় আপনাদের জন্য স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ঘর-সংসার করা বৈধ হবে না। (ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী-১/৩৫৬, আল বাহরুর রায়েক-৩/২৫৫, ইমদাদুল আহকাম-২/৪৭২)

প্রসঙ্গ : ইলম

মুহা. নূরুল হক
ব্লক-জি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

প্রশ্ন-১. কেয়ামতের দিন যখন পুনরুত্থান হবে তা শারীরিকভাবে এবং প্রত্যেকের দৈহিক বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে হবে কি না? অর্থাৎ অন্ধ ব্যক্তির অন্ধ অবস্থায় বা পঙ্গু ব্যক্তির পঙ্গু অবস্থায় পুনরুত্থান হবে কি না?

প্রশ্ন-২. পারলৌকিক জীবনে মানুষ ক্ষুধা-তৃষ্ণা অনুভব করবে না এবং প্রস্রাব, পায়খানা, গোসল এ-জাতীয় অনেক শারীরিক কার্যক্রমের প্রয়োজন হবে না। তাহলে সেই জীবন কি শারীরিক হবে, না আধ্যাত্মিক?

প্রশ্ন-৩. ইসলামে ৩, ৭, ৪০ এ ধরনের কিছু সংখ্যার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। দু'আ অনুষ্ঠানে বলা হয় এটি ৩ বার, এটি ৭ বার পড়ুন। মৃত্যুর পর চল্লিশা বা চেহলাম করা হয়। আরো জানা যায়, ফেরেশতা ইস্রাফিল (আ.) এবং আল্লাহর আরশের মধ্যে ৭০ হাজার পর্দা আছে, পাপীর কবরে ৭০ হাজার সাপ ছেড়ে দেওয়া হয়–এ ধরনের অনেক ক্ষেত্রেই ৭০ হাজার কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায়। কোরআন বা হাদীসে কি এ বিষয়ে কোনো বক্তব্য আছে?

সমাধান :

১। প্রত্যেক মানুষ যে অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছিল ও তার দৈহিক কাঠামোর সাথে যখন সর্বপ্রথম রূহের সংযোগ হয়েছিল সেই অবস্থায় তার পুনরুত্থান হবে পরবর্তীতে পঙ্গু হলে তা ধর্তব্য হবে না। (সূরা আম্বিয়া-১০৪, বুখারী শরীফ-৪/৩৩৪৯, শরহে আকাইদ-১০০)

২। পারলৌকিক জীবন শারীরিক হবে কিন্তু জান্নাতের অফুরন্ত নেয়ামতের কারণে সে ক্ষুধা-তৃষ্ণা অনুভব করবে না। সুগন্ধময় ঘাম এবং ঢেঁকুরের মাধ্যমে খানা হজম হয়ে যাওয়ার কারণে পায়খানা-প্রস্রাবেরও প্রয়োজন হবে না। (বুখারী শরীফ-২/৩৩৫, মুসলিম শরীফ-৪/২১৮)

৩। কোরআন ও হাদীসে ৩, ৭, ৪০, ৭০-এর এমন কিছু বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়, যা সাধারণত অন্য সংখ্যার মধ্যে পাওয়া যায় না। তবে শরীয়তে চল্লিশা বা চেহলামের কোনো ভিত্তি নেই। (সুনানে তিরমিযী-৪/৬০৩, মু'জামুল কবির-৮/১৫৮, বুখারী শরীফ-৭/৫২)

মাসিক আল-আবরারের গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি

এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

*	কমপক্ষে ১০ কপির এজেন্সি দেয়া হয়।
*	২০ থেকে ৫০ কপি পর্যন্ত ১টি, ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত ২টি, আনুপাতিক হারে সৌজন্য কপি দেয়া হয়।
*	পত্রিকা ভিপিএলে পাঠানো হয়।
*	জেলাভিত্তিক এজেন্টদের প্রতি কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়। লেনদেন অনলাইনের মাধ্যমে করা যাবে।
*	২৫% কমিশন দেয়া হয়।
*	এজেন্টদের থেকে অগ্রীম বা জামানত নেয়া হয় না।
*	এজেন্টগণ যেকোনো সময় পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্ডার দিতে পারেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম
বার্ষিক চাঁদার হার

	দেশ	সাধ.ডাক	রেজি.ডাক
#	বাংলাদেশ	৩০০	৩৫০
#	সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০	১০০০
#	মধ্যপ্রাচ্য	১১৮০	১৩০০
#	মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	১৩০০	১৫০০
#	ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া	১৬০০	১৮০০
#	আমেরিকা	১৮০০	২১০০

১ বছরের নিচে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক চাঁদা মনিঅর্ডার, সরাসরি অফিসে বা অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো যায়।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট :

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
আল-আবরার-৪০১৯১৩১০০০০০১২৯
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
আল-আবরার-০৮৬১২২০০০০৩১৪

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) স্মরণে

বিশ্বখ্যাত উলামায়ে কেরামের বেদনাহত অভিব্যক্তি

বিশ্ববিখ্যাত দারুল উলূম দেওবন্দের সম্মানিত মুহতামিম আল্লামা মুফতী আবুল কাসেম নোমানী দা. বা.

বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমে দ্বীন, মুফাক্কিরে ইসলাম মুসলিহে উম্মাত ফকীহে মিল্লাত হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.) গত ১০ নভেম্বর ২০১৫ ইং তারিখে পরপারের পথে পাড়ি জমিয়েছেন। হযরত মুফতী সাহেবের বার্ধক্য এবং লাগাতার অসুস্থতা সত্ত্বেও তাঁর দেশে এবং বিদেশে সফরের ধারা বন্ধ ছিল না। কিন্তু মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে থেকে তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন চিকিৎসার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তিনি ৯৬ বছর বয়সে আপন রবের সাথে মিলিত হয়েছেন।

انا لله وانا اليه راجعون

দারুল উলূম দেওবন্দের সাথে আমার সম্পৃক্ততার পর থেকে দারুল উলূমের নিসবতে প্রতি বছর আমি সপ্তাহ-১০ দিনের জন্য বাংলাদেশ সফর করি। প্রতিটি সফরে এই অধমের ওপর তাঁর অনুগ্রহ ছিল বর্ণনাতীত। মুফতী সাহেব (রহ.) ১৯২২ সালে চট্টগ্রামের ইমামনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, যা তৎকালীন সময়ে অবিভক্ত ভারতের আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাথমিক শিক্ষা নিজ দেশে অর্জন করার পর তিনি ১৯৫০ সালে দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন এবং দেওবন্দে জামাতে দাওরায়ে হাদীস থেকে ইফতা পর্যন্ত অত্যন্ত সুনাম এবং দক্ষতার সাথে পড়ালেখা সমাপ্ত করেন। তিনি শায়খুল ইসলাম মাওলানা সৈয়দ হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর প্রথমসারির ছাত্র ছিলেন। পড়ালেখা সমাপনান্তে শিক্ষকতার মহান পবিত্র পেশা দিয়ে তাঁর কর্মজগতে প্রবেশ। এরপর নিজেই বসুন্ধরায় মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী নামে একটি উচ্চতর গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন করেন। শাহ সৈয়দ মাওলানা আবরারুল হক হারদূয়ী (রহ.)-এর সাথে তাঁর আধ্যাত্মিক সম্পর্ক ছিল। মুফতী সাহেব হারদূয়ী হযরতের খেলাফত লাভেও ধন্য হন। পুরো দেশে মুফতী সাহেবের অগণিত ছাত্র-ভক্ত ইলমে দ্বীনের খেদমতে নিয়োজিত আছেন। হযরতের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহ তাঁর খোলাফা ও ছাত্ররা তাঁর জন্য কেয়ামত পর্যন্ত সদকায়ে জারিয়া হিসেবে অবশিষ্ট থাকবে। মুফতী সাহেবের মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন দরদি মুরব্বি শীর্ষস্থানীয় আল্লাহওয়ালাকে হারাল, যা কোনোভাবেই পূরণীয় নয়। আল্লাহ তা'আলা আপন অনুগ্রহে হযরতের যাবতীয় খেদমতকে কবুল করুন এবং তাঁকে জান্নাতের উচ্চাসনে সমাসীন করুন। দারুল উলূমে মুফতী সাহেবের মৃত্যুর খবর পৌঁছার সাথে সাথে ঈসালে সাওয়াব এবং দু'আয়ে মাগফিরাতের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়।

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের পুরোধা সৈয়দ হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর সুযোগ্য সাহেবজাদা আওলাদে রাসূল আল্লামা সৈয়দ আরশাদ মাদানী দা.বা. সিনিয়র মুহাদ্দিস দারুল উলূম দেওবন্দ

মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)-কে কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে বাংলাদেশের শীর্ষ আলেমদের মধ্যে গণ্য করা হতো। মাদানী (রহ.)-এর প্রিয় ছাত্র হিসেবেও তিনি খ্যাত ছিলেন। তিনি ছিলেন পূর্বসূরি আকাবির-আসলাফের জীবন্ত নমুনা। এ ছাড়া তিনি বাংলাদেশে গড়ে তুলেছেন অসংখ্য বড় বড় দ্বীনি প্রতিষ্ঠান, যেগুলোতে অধমও বারবার তাঁর আহ্বানে হাজির হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। ওই সব প্রতিষ্ঠানে আমি যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেছি, তা হলো ছাত্রদের থাকা-খাওয়ার সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনা যে ব্যাপারে অন্য সব মাদরাসায় দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়েছে। আমার মতে, এটা থেকে মুফতী সাহেব (রহ.)-এর উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের সর্বোচ্চ তারবিয়াত এবং দীক্ষার ব্যবস্থা করা। কেননা দ্বীনি ইলমের মূল প্রাণ হলো তারবিয়াত তথা দীক্ষা। আকাবিরদের জীবনীতে আমরা যে বিষয়টি দেখতে পাই তা হলো সে যুগে ছাত্ররা প্রথমে নিজেদেরকে কোনো আল্লাহওয়ালার সান্নিধ্যে সংশোধন ও পরিশুদ্ধ করতেন। এরপর কোনো প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করতেন। ফলে তাঁদের ছাত্ররাও দিগ্‌ভ্রান্ত উম্মতের জন্য আলোকবর্তিকা হিসেবে আবির্ভূত হতেন। হযরত মুফতী সাহেব (রহ.) নিজের জীবনকে যুগশ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের সান্নিধ্যে থেকে সুশোভিত করেন এবং নিজের পুরো জীবনকে ইলম-আমলের সেবায় ব্যাপৃত করেন। এখন এই মহামনীষী আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেলেও আমাদের মাঝে এখনো রয়ে গেছে তাঁর রেখে যাওয়া বিশাল বিশাল কর্মযজ্ঞ। আমরা আল্লাহর কাছে দু'আ করছি তিনি যেন ওই সব প্রতিষ্ঠানকে কেয়ামত পর্যন্ত স্বমহিমায় টিকিয়ে রাখেন। ওই সব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ুক হেদায়তের আলো। হে আল্লাহ! তুমি মরহুমের কবরকে জান্নাতের পুষ্পোদ্যানে পরিণত করে দাও এবং তাঁর ভক্ত-অনুরক্তদেরকে অবশিষ্ট জীবন তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে কাটানোর তাওফিক দান করো।

বিশ্বনন্দিত ফকীহ ও হাদীসবিশারদ শায়খুল ইসলাম হযরত আল্লামা মুফতী তকী উসমানী দা. বা.

জনাব মাওলানা মুফতী আরশাদ সাহেব এবং মাওলানা শাহেদ রহমানী সাহেব হাফিজাহুল্লাহু

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

হঠাৎ হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুর রাহমান সাহেবের মৃত্যুর খবর পেলাম, প্রথমে মনে হলো হয়তো ভুল সংবাদ শুনেছি। কিন্তু পরে মাওলানা শাহেদের সাথে কথা বলে ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হলাম। অন্তরে বড় ধরনের ঝাঁকুনি খেলাম।

انا لله وانا اليه راجعون

মুফতী সাহেব (রহ.) নিজ দেশ ও জাতির জন্য বড় ধরনের নেয়ামত ছিলেন। তিনি দ্বীনের অনেক বড় বড় কাজের গোড়াপত্তন করেছেন। তাঁর বিশাল কীর্তি এবং অবদান আমাদের ইতিহাসের এক উজ্জ্বলতম অধ্যায়। অধমের সাথে তিনি যে অপরিমেয় দয়া এবং মুহাব্বতের আচরণ করতেন তা কোনো দিনও বিস্মৃত হওয়ার মতো নয়। তাঁর মৃত্যুতে মনে হচ্ছে আমার মাথার ওপর থেকে যেন বড় ধরনের একটা ছাতা উঠে গেল। হযরতের মৃত্যুতে আপনারা যে কষ্ট পেয়েছেন তা সহজেয় অনুমেয়। সাথে সাথে এটাও অনস্বীকার্য যে তাঁর মৃত্যুতে আপনাদের স্কন্ধে অনেক বড় বড় দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। আশা করি, আপনারা আল্লাহ তা'আলার হুকুমকে অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নেবেন এবং ধৈর্য ও অবিচলতার পরিচয় দেবেন। আল্লাহ তা'আলার শাশ্বত বিধান হলো, তিনি ধৈর্যশীলদের অগণিত পুরস্কারে ভূষিত করেন এবং তাদেরকে জীবনের সব কণ্টকাকীর্ণ পথে সাহায্য করেন। ইনশাআল্লাহ আপনারা পূর্ণ নিষ্ঠা, ইখলাস ও আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হয়ে তাঁর মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। তাহলে আশা করা যায় মহান আল্লাহর সাহায্যের কুদরতী হাত আপনাদের ওপর সর্বদা থাকবে। আসল কথা হলো, তাঁর হাতে সূচিত সকল দ্বীনি কাজকে তাঁর মতো করে পূর্ণাঙ্গ ইখলাস, নিষ্ঠা ও সততার সাথে আঞ্জাম দেওয়ার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাতে হবে। নিজের মুরব্বিদের কাছ থেকে সর্বদা পরামর্শ নেবেন। ইনশাআল্লাহ সফলতা আপনাদের পদচুম্বন করবেই করবে। স্মরণ রাখবেন, এই বিচ্ছেদ অস্থায়ী। যদি ঈমান এবং সৎকর্ম করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারি, তাহলে ইনশাআল্লাহ পরকালে এমন সাক্ষাৎ হবে, যার পরে আর কোনো বিচ্ছিন্নতা নেই। আমার পক্ষ থেকে আপনাদের পরিবারের সকল সদস্য এবং মাদরাসার সকল সদস্যকে আন্তরিক সমবেদনা জানাবেন। আল্লাহ তা'আলা মরহুমকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চাসনে সমাসীন করুন। আপনাদেরকে উত্তম সবর ও অগণিত নেয়ামতে ডুবিয়ে রাখুন। আল্লাহ আপনাদের চলার পথে সহায় হোন। আমীন।

ইসলামী দুনিয়ার প্রবীণ মুহাদ্দিস ও বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব হযরত মাওলানা শায়খ আব্দুল হক আ'জমী শায়খুল হাদীস, দারুল উলুম দেওবন্দ

মৃত্যু একটি অবশ্যম্ভাবী বস্তু, যাকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। মৃত্যুকে পবিত্র কোরআনে ইয়াকীন শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। সে জন্য সবাই মৃত্যুকে বিশ্বাস করতে বাধ্য। আল্লাহর সত্তা ব্যতীত পৃথিবীতে এমন কোনো বস্তু নেই, যাকে মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করতে হবে না। কোরআনে বর্ণিত হয়েছে–

كل شئ هالك الا وجهه

অর্থাৎ আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সব কিছুই মরণশীল। কিন্তু মৃত্যুবরণকারীরা দুই ধরনের হয়ে থাকে। এক ধরনের মানুষের মৃত্যু পৃথিবীবাসীর জন্য রহমতের কারণ হয়। আরেক ধরনের মানুষের মৃত্যুতে পৃথিবীতে নেমে আসে শোক আর বিষাদের ছায়া। কয়েক দিন পূর্বে আমাদেরকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে যিনি পরপারের যাত্রী হয়েছেন অর্থাৎ ফকীহুল মিল্লাত, মুহাদ্দিসে আজম, মুফাক্কিরে ইসলাম মাওলানা মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.) ছিলেন ক্ষণজন্মা ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন শরীয়ত বিশেষজ্ঞ, নববী চরিত্রের মূর্ত প্রতীক, বিনয় এবং নম্রতার ক্ষেত্রে পূর্বসূরিদের প্রকৃষ্ট নমুনা, অসংখ্য দ্বীনি মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা ও মূল চালিকাশক্তি। উচ্চ স্তরের মুফতী এবং ফকীহ হওয়ার সাথে সাথে তিনি ছিলেন খোদাপ্রেমিক সাচ্চা আশেকে রাসূল। তাঁর মৃত্যুতে অসংখ্য মাদরাসা হারাল একজন দূরদর্শী পৃষ্ঠপোষক আর ছাত্ররা হারাল একজন মহান দরদি অভিভাবক এবং যোগ্য মুরব্বি। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে উত্তম বিনিময়ে ভূষিত করুন এবং আমাদেরকে অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা এবং বাহ্যিক ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে পূতঃ-পবিত্র করে গড়ে তুলুন। তাঁর মাঝে সমাহার ঘটেছিল অসংখ্য গুণাগুণের। তিনি দুর্বল এবং অসহায় লোকদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাদের কাছে এক জবরদস্ত আমানত ছিলেন। আল্লাহর যত দিন ইচ্ছা ছিল ওই আমানতকে আমাদের মাঝে রেখে তাঁর কাছ থেকে ভরপুর কাজ নিয়েছেন। আর যখন তাঁর নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে এল তখন ওই আমানতটিকে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে নিলেন। আমরা মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে ফরিয়াদ করছি, তিনি যেন মরহুমকে জান্নাতুল ফিরদাউসের মেহমান হিসেবে কবুল করে নেন এবং সে সমস্ত কাজ, যা তিনি অসমাপ্ত রেখে গেছেন আমাদেরকে সেগুলোর পূর্ণতা দানের তাওফিক দান করুন। বিশেষত হযরতের বড় সাহেবজাদা মুফতী আরশাদ রহমানীকে

আল্লাহ তা'আলা ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর সুযোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে কবুল করুন এবং তাঁকেও ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর মতো দ্বীনের জন্য কবুল করুন। হযরতের সাথে সম্পৃক্ত যত মুরীদান, ছাত্র-শিক্ষক রয়েছেন, সবাইকে সবরে জামীলের তাওফিক দান করুন এবং তাদের কাছ থেকে হযরতের জীবদ্দশায়ই যেভাবে কাজ নিয়েছেন, সেভাবে হযরতওয়ালা (রহ.)-এর মৃত্যুর পরও যেন তাদের কাছ থেকে কাজ নেন। সবার জন্য আমি এই দু'আই করছি।

ঐতিহাসিক তারানায়ে দারুল উলূম দেওবেন্দের রচয়িতা, বিখ্যাত হাদীস ব্যাখ্যাকার হযরতুল আল্লাম মাওলানা রিয়াসত আলী বিজনুরী মুহাদ্দিস দারুল উলূম দেওবন্দ

বড় দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.) ১০ নভেম্বর ২০১৫ ইং তারিখে আমাদেরকে এতীম করে পরপারের পথে পাড়ি জমিয়েছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

মহান আল্লাহর শাহী দরবারে কায়মনোবাক্যে দু'আ করছি, তিনি যেন মরহুমের জীবনের সব কাজকে কবুল করে নেন এবং তাঁকে নিজের মাগফিরাতের চাদরে ঢেকে জান্নাতুল ফিরদাউসের সম্মানিত মেহমান হিসেবে কবুল করেন। মরহুমের সাথে আমার পরিচয় দীর্ঘদিনের। ১৯৫৩ ইং সালে আমি তেরো বছরের কিশোর ছিলাম। হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) তখন দারুল ইফতার তালেবুল ইলম ছিলেন। শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর সুবাদে তিনি মাদানী মসজিদে নামায পড়াতেন। আমি যেহেতু সে মহল্লায় বসবাস করতাম, সে জন্য প্রায় সময় তাঁর পেছনে নামায আদায়ে সৌভাগ্য হতো। ছাত্র যমানার এই পরিচয়ের কথা হযরত (রহ.)-এর স্মরণ ছিল। কয়েক বছর পূর্বে একটি ফিকহী সেমিনারে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন, তুমি ওই রিয়াসত আলী না, যে লোকমান কারুতীর সাথে সুলতানুল হকের অধীনে পড়ালেখা করতে? মরহুম (রহ.) ছাত্র যমানা থেকেই সময়ের প্রতি খুব বেশি গুরুত্বারোপ করতেন। তখন দারুল ইফতার প্রধান ছিলেন মুফতী মাহদী হাসান শাহজাহানপুরী (রহ.)। এ ছাড়া মুফতী আহমদ আলী সাঈদ (রহ.) তাঁর সহকারী হিসেবে ছিলেন। মাওলানা আহমদ আলী সাঈদ (রহ.) মরহুম ফকীহুল মিল্লাতকে খুব বেশি বিশ্বাস করতেন। যার কারণে দারুল ইফতার চাবি ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর কাছেই থাকত। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তিনি দারুল ইফতার কিতাবগুলো অধ্যয়নে অহর্নিশি মগ্ন থাকতেন। মরহুম (রহ.) দারুল উলূমে দাওরা হাদীস এবং ইফতা সমাপনান্তে নিজ দেশে ফিরে যান। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তিনি জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় শিক্ষক হিসেবে খেদমতে নিয়োজিত থাকেন। ওই সময়ে তিনি তানজীমুল মাদারিসিল আরবিয়া নামে একটি সম্মিলিত মাদরাসা বোর্ডও গঠন করেন। সর্বশেষ তিনি ঢাকার বসুন্ধরাতে মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী নামে একটি উচ্চতর গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন করেন। মরহুমের ইখলাসেরই বরকত বলতে হয়, ওই প্রতিষ্ঠানটি স্বল্প সময়ে যথেষ্ট উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করে। বর্তমানে সেটিই বাংলাদেশের প্রথমসারির প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত হয়। কয়েক বছর পূর্বে অধমের ওই মারকায জিয়ারতের সৌভাগ্য হয়। তখন দারুল ইফতায় কেবল ১০০ জন ছাত্র ছিল। তাদের তত্ত্বাবধান এবং দেখাশোনার জন্য সেখানে ১০ জন মুফতী নিয়োজিত ছিলেন। সেখানে আরেকটি চমৎকার বিষয় দেখে উদ্দীপিত হয়েছিলাম। তা হলো প্রত্যেক ছাত্রের মূল্যবান কিতাবাদীর একেকটা স্তূপ ছিল। পড়ালেখায় ব্যস্ত থাকার পাশাপাশি তিনি শাহ আবরারুল হক (রহ.)-এর কাছ থেকে খেলাফত লাভেও ধন্য হন। তাঁর মুরীদান এবং ভক্তের সংখ্যাও অগণিত। আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করি তিনি মরহুমের দরজা বুলন্দ করুন। উম্মতকে তাঁর নি'মাল বদল তথা উত্তম বিনিময় দান করুন। তাঁর উত্তরাধিকারী পরিবারবর্গ ও অনুসারীদেরকে উত্তম সবরের তাওফিক দান করুন এবং তাঁর রেখে যাওয়া মিশনকে সামনে নিয়ে যাওয়ার তাওফিক দান করুন। আমীন।

হযরত মাওলানা আব্দুল খালেক সাম্বলী দারুল উলূম দেওবন্দ

আকাবিরে আসলাফের প্রোজ্জ্বল নমুনা ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)

আধ্যাত্মিক জগতের মুকুটহীন সম্রাট ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.) জীবনের ৯৬টি বসন্ত অতিক্রম করার পর গত ২৮ মুহাররম ১৪৩৭হি. মোতাবেক ১০ নভেম্বর ২০১৫ ইং স্বীয় প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারের যাত্রী হয়ে গেলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

নিজ দেশে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি উচ্চশিক্ষা লাভের মহান ব্রত নিয়ে ১৯৫০ সালে ভর্তি হন উপমহাদেশের দ্বীনি শিক্ষার মহান সূতিকাগার দারুল উলূম দেওবন্দে। দেওবন্দের যুগশ্রেষ্ঠ মনীষীদের সান্নিধ্য থেকে নিজেকে ভবিতব্যের জন্য

যথাযথভাবে তৈরি করে নেন। শায়খুল ইসলাম সৈয়দ হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর কাছে তাঁর বুখারী শরীফ ও তিরমিযী শরীফের দরস নেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। দাওরায়ে হাদীসের পর ইফতায়ও তিনি সফলতার স্বাক্ষর রাখেন। জ্ঞানের মাতৃক্রোড় দেওবন্দ থেকে ইলম-আমলে সুসজ্জিত হয়ে তিনি সর্বপ্রথম নিজের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের চট্টগ্রামের একটি প্রসিদ্ধ দ্বীনি দরসেগাহে ইলমের খেদমতে প্রবৃত্ত হন। সে সময় তিনি বাংলাদেশের ১৮ জেলার কওমী মাদরাসাগুলো নিয়ে গঠন করেন তানজীমুল মাদারিসিল আরবিয়া নামের একটি বৃহৎ মাদরাসা বোর্ড। এর কিছুদিন পর তিনি ঢাকার প্রাণকেন্দ্র বসুন্ধরায় মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী নামে একটি বিশাল উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্রের গোড়াপত্তন করেন। বেশকিছু দিন ধরে তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। তা সত্ত্বেও গত বছর যখন মারকাযে আমি উপস্থিত হই তখন আমার সাথে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন এবং নিজের প্রিয় প্রতিষ্ঠান দেওবন্দের খোঁজখরব নেন। আমি দেওবন্দ ফিরে আসার পর দেওবন্দের সিনিয়র মুফতী ও মুহাদ্দিস মাওলানা জামীল আহমদের মাধ্যমে আমার জন্য কিছু মূল্যবান হাদিয়া পাঠান হযরতওয়ালা ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)। এ ঘটনা স্মরণ হলে আমার এখনো আশ্চর্য লাগে তিনি কত দূরদর্শিতাসম্পন্ন আল্লাহওয়ালা বুজুর্গ ছিলেন! এ ছাড়া তাঁর মাঝে আরো অসংখ্য উচ্চ গুণাবলির সমাহার ঘটেছিল, যেগুলো লেখার মাধ্যমে বর্ণনায়নও সম্ভব নয়। আল্লাহ মরহুমকে জান্নাতুল ফিরদাউসের মেহমান হিসেবে কবুল করুন এবং আমাদেরকে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

হযরত মাওলানা মুফতী অসি আহমদ
শিক্ষা বিভাগীয় পরিচালক,
জামিয়া ইমাম আনোয়ার শাহ, দেওবন্দ।

বিশ্বখ্যাত আলেমে দ্বীন, প্রসিদ্ধ আধ্যাত্মিক রাহবার হযরত ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)-এর মৃত্যু দেওবন্দী ঘরানার উলামা-মাশায়েখদের জন্য একটি বড় দুঃসংবাদ। জন্মসূত্রে তিনি বাংলাদেশি হলেও বহির্বিশ্বেও তিনি মুসলিম উম্মাহর কাছে সমানভাবে সমাদৃত ছিলেন। বিভিন্ন কারণে তিনি কয়েকবার দেওবন্দ তাশরীফ এনেছেন। দেওবন্দে বিশেষ মেহমান হিসেবে তিনি আলাদা সম্মান পেতেন। তখন যে কেউ হযরতের সাথে সাক্ষাৎ করতেন, তাঁর অন্তরে বদ্ধমূল ধারণা হতো যে আমি একজন খাঁটি আল্লাহওয়ালার সাথে সাক্ষাৎ করেছি।

সাধারণত কেউ আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ করলে দেখা যায়, তাঁর ইলম চর্চায় ভাটা পড়ে যায়। কিন্তু তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ এর ব্যতিক্রম। তাঁর মজলিসে অসংখ্যবার এই আশ্চর্য দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য হয়েছে যে তাঁকে জটিল থেকে জটিল প্রশ্ন করা হলেও তিনি তৎক্ষণাৎ তার সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করতেন। মনে হতো যেন তিনি এইমাত্র কিতাব অধ্যয়ন করে এসেছেন। হযরতওয়ালা (রহ.)-এর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছার সাথে সাথে পুরো দেওবন্দে শোকের ছায়া নেমে আসে। বিশেষত যাঁরা হযরতের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন, তাঁদের অবস্থা সবচেয়ে করুণ হয়ে যায়। ছোট-বড় সকল প্রতিষ্ঠানে হযরতওয়ালা (রহ.)-এর জন্য ঈসালে সাওয়াবের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। রাব্বুল আলামীন হযরতওয়ালা (রহ.)-এর দরজা বুলন্দ করুন এবং তাঁর উত্তরসূরিদেরকে যথাযথভাবে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করার তাওফিক দান করুন। আমীন

হযরত মাওলানা আব্দুর রশীদ বস্তভী
শিক্ষক, জামিয়া ইমাম মুহাম্মদ আনোয়ার, দেওবন্দ।

মুজাদ্দিদে মিল্লাত, হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর কর্মকাণ্ড ছিল বহুমুখী। তেমনি দ্বীনের প্রতিটি শাখা-প্রশাখায় তাঁর অবদানও অবিস্মরণীয়। তাসাউফ এবং তরীকতের নাম দিয়ে জাহেল এবং অজ্ঞদের বড় একটি দল কুসংস্কার এবং বিদ'আতকে বাস্তব দ্বীন-ঈমান জ্ঞান করে ইসলামের বাস্তব শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল। সাধারণ মুসলমানরাও তাদের জাঁকজমক ও রংঢঙে প্রভাবিত হয়ে সেটাকেই আসল দ্বীন মনে করে বসে। তখন তাদের কাছে শরীয়তের সারাংশই ছিল নযর-নিয়াজ, ওরস, তবারুক এবং কাওয়ালী। হযরত থানভী (রহ.) তাসাউফ এবং তরীকতকে এসব কুসংস্কার এবং ভ্রান্তি থেকে পবিত্র করে তার আসল আকৃতিতে উম্মাহর সামনে পেশ করেছেন এবং শরীয়তের বিশুদ্ধ ও পূর্ণ জ্ঞান থাকা এবং সুন্নাতের অনুরণকে তাসাউফের মূল প্রাণ হিসেবে অভিহিত করেছেন। থানভী (রহ.)-এর সাথে যাঁরা সম্পৃক্ত ছিলেন, বিশেষত তাঁর খোলাফা ও অনুসারীদের মাঝেও দ্বীনের এই বিশুদ্ধ আকৃতি পরিলক্ষিত হয়। এ জন্য থানভী ধারার প্রত্যেকেই ছিলেন একেকজন সত্যের ঝাণ্ডাবাহী। গত শতাব্দীতে আল্লাহ তা'আলা শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (রহ.)-এর ছাত্রদের

থেকে আর হযরত থানভী (রহ.)-এর খলিফাদের মাধ্যমে ইসলামের যে চতুর্মুখী খেদমত নিয়েছেন, অন্য কারো ছাত্র এবং খলিফাদের কাছ থেকে এ ধরনের খেদমত নেননি। তাঁদের ছাত্রও খলিফারা যেভাবে দ্বীনের কাজের জন্য কোরবান ছিলেন, তদ্রূপ তাঁদের ছাত্রের ছাত্র ও খলিফার খলিফারাও ছিলেন দ্বীনের জন্য আত্মনিবেদিত। থানভী পুষ্পোদ্যানের সর্বশেষ পুষ্প ছিলেন হযরত শাহ আবরারুল হক হারদূয়ী (রহ.)। তাঁরই শীর্ষস্থানীয় খলিফা ছিলেন ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)। সাথে সাথে তিনি ছিলেন কুতুবে আলম সৈয়দ হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর নিজ হাতে গড়া শাগরেদ। তিনি ছিলেন উভয় আকাবিরের স্বচ্ছ প্রতিচ্ছবি ও সার্থক উত্তরাধিকারী। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের অজস্র দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্ণধার ও মূল চালিকাশক্তি। অর্ধশতাব্দী ধরে বুখারী শরীফসহ সিহাহ সিত্তার পাঠদান করেছেন অত্যন্ত সুনাম ও কৃতিত্বের সাথে। একদিকে ছিলেন শরীয়তের অবিসংবাদিত ইমাম, অন্যদিকে তরীকতের ময়দানে মুকুটহীন সম্রাট। সুন্নাতের অনুসরণ ছিল তাঁর জীবনের অনন্য ও স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। ইলম ও আহলে ইলমের যথাযথ সম্মান করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব। অধীনস্থ এবং সংশ্লিষ্টদের খোঁজখবর রাখা ও তাদের যথাযথ সংশোধনেই ছিল তাঁর আত্মিক প্রশান্তি। দুই বছর পূর্বে তিনি জমঈয়তে উলামায়ে হিন্দের একটি সেমিনারে অংশগ্রহণ করার জন্য দেওবন্দে তাশরীফ নিয়ে আসেন। দেওবন্দ অবস্থানকালে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের সুযোগ্য শিক্ষক মুফতী জামীল আহমদের নতুন বাড়ি তথা আল-বালাগ লাইব্রেরির দ্বিতীয় তলায় অবস্থান করছিলেন, তখন অধম হযরতের সাথে সাক্ষাৎ করি। তখন আমি তাঁর চেহারার মধ্যে এক ধরনের নূর দেখতে পাই। ওই মজলিসে তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাই। বার্ধক্যে উপনিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল প্রবাদতুল্য। হযরত মুফতী সাহেব (রহ.)-এর নূরানী চেহারায় নজর পড়ার সাথে সাথে আমার অন্তরে তাঁর প্রতি অনির্বচনীয় ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। এ ভালোবাসা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

মাওলানা জামীল আহমদের মুখে হযরতওয়ালা (রহ.)-এর মৃত্যুর দুঃখজনক সংবাদ শুনে আমি প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খাই। অভ্যাস অনুযায়ী তখনই তিনবার সূরা ইখলাস পাঠ করে তাঁর জন্য ঈসালে সাওয়াব করি এবং তাঁর মাগফিরাতের জন্য দু'আ করি। হযরত মুফতী সাহেব (রহ.) নির্ধারিত সময়েই ইহকালের মায়া ছেড়ে পরকালের যাত্রী হয়ে গেলেন। সবাইকেই ইহকালের মায়া ত্যাগ করে পরপারের যাত্রী হতে হবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কিছু স্পেশাল মানুষ রয়েছেন, যাঁদের অস্তিত্বই মানবজাতির জন্য রহমতস্বরূপ এবং যাঁদের মৃত্যু মানবজাতির জন্য অপূরণীয় ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত হয়। মুফতী সাহেব (রহ.) ছিলেন সেই ধরনের মানুষ।

মুফতী সাহেব (রহ.)-এর জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল দিক হলো, সুন্নাতের অনুসরণ। তাঁর শিরায় শিরায় প্রোথিত ছিল সুন্নাতের ভালোবাসা। এক কবি চমৎকার কথা বলেছেন–

ہرگز نہ میرد آنکہ دلش زندہ شد بہ عشق
ثبت است بر جریدہ عالم دوام ما

অর্থাৎ ওই ব্যক্তির কখনো মৃত্যু হবে না, যার অন্তর নববী ইশকের অমৃত সুধা পানে জীবিত, পৃথিবীর যত দিন স্থায়িত্ব আছে, তত দিন সেও থাকবে অমর। হযরত মুফতী সাহেব (রহ.)-এর অভিজ্ঞতার ঝুলি ছিল অত্যন্ত ঋদ্ধ। সাথে সাথে যুগের শ্রেষ্ঠ এবং আলোকিত মনীষীদের সান্নিধ্যে তাঁর ঋদ্ধ অভিজ্ঞতা হয়েছিল আরো পরিপক্ব এবং পরিপুষ্ট। কিন্তু আফসোস, শত আফসোস! আমাদের গর্বের ধন আর চেতনার বাতিঘরগুলো একে একে মৃত্যুর করাল গ্রাসে পরিণত হচ্ছে। আমরা হারাচ্ছি আমাদের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের। আমাদের ভবিতব্যের কণ্টকাকীর্ণ পথটা আরো বন্ধুর পিচ্ছিল হচ্ছে। কবির কণ্ঠে এটারই যেন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে–

اس برق گردی جو شجر پرانا تھا
وہی چراغ بجھا جس کی لو قیامت تھی

অর্থ, বজ্রাঘাতে জ্বলেপুড়ে ভস্ম হলো শতবর্ষী বটবৃক্ষটাই, নিভে গেল ওই প্রদীপটি, যার আলোতে আলোকিত ছিল পুরো বিশ্বজাহান। মহান রাব্বুল আলামীনের অসীম দয়া এবং করুণার দিকে লক্ষ করে আমরা সন্দেহাতীতভাবে বলতে পারি, তিনি হযরত মুফতী সাহেব (রহ.)-কে নিজের সম্মানিত মেহমান হিসেবে কবুল করে নিয়েছেন এবং তাঁকে জান্নাতের উচ্চাসনে সমাসীন করেছেন।

رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ وانزل علیہ شآبیب رضوانہ

হযরত মাওলানা মুফতী এজাযুল হাসান কাসেমী
প্রধান সম্পাদক, সাবীলুল হুদা ও চেয়ারম্যান কেন্দ্রীয় শরীয়াহ বোর্ড কাশ্মীর, ইন্ডিয়া।

অল্প কিছুদিন পূর্বে মুসলিম উম্মাহকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে পরপারের যাত্রী হয়েছেন বাংলাদেশের আধ্যাত্মিক জগতের সম্রাট ফকীহুল মিল্লাত হযরত আকদস মাওলানা মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব কাসেমী (রহ.)। তাঁর সবচেয়ে উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য হলো, সমাজের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে অনুপ্রবেশকারী বিদ'আত-কুসংস্কার দূরীকরণে তিনি অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছেন। আর সমাজের সর্বস্তরে দ্বীনের সঠিক শিক্ষার প্রচার-প্রসারের মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে শহরাঞ্চল থেকে মফস্বল সর্বত্র গড়ে তুলেছেন অসংখ্য-অগণিত দ্বীনি প্রতিষ্ঠান। হযরতওয়ালা (রহ.)-এর জীবনযাপন ছিল একেবারেই সাদামাটা ও অনাড়ম্বর। ইসতেগনা বা অমুখাপেক্ষিতা ছিল তাঁর জীবনের অনন্য বেশিষ্ট্য। সম্পদ এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির সামনে মাথা নোয়ানো ছিল তাঁর আজন্ম স্বভাববিরুদ্ধ। অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক হওয়া সত্ত্বেও দশটি বড় বড় প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নের গুরুদায়িত্ব ছিল তাঁর স্কন্ধে। ইহকালের ওপর পরকালকে প্রাধান্য দেওয়ার সুস্পষ্ট ফলাফল ছিল এটাই যে, বিত্তশালীরা তাঁর জন্য সম্পদ ব্যয় করতে পারাকে নিজেদের জন্য পরম সৌভাগ্য মনে করতেন। আর তিনিও জনসাধারণের প্রদত্ত সম্পদকে যথাযথ ব্যবহার করার মাধ্যমে তাঁদের পরকালীন জীবন সুশোভিত ও আরামদায়ক করার চিন্তায় সদা সচেষ্ট ছিলেন।

আমার অত্যন্ত প্রিয় শিক্ষক মাওলানা জামীল আহমদ সাহেব প্রায়ই বলতেন, যখন থেকে হযরতের সাথে সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, তখন থেকে হযরতের ভক্তি এবং ভালোবাসা কেবল বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাঁর নূরানী মজলিসে বসলে মনে হতো, অন্তরাত্মা পরিশুদ্ধ এবং পবিত্র হচ্ছে।

রাসূল (সা.)-এর প্রতি মুফতী সাহেবের ভক্তি ও ভালোবাসা ছিল অতলস্পর্শী ও বর্ণনাতীত। তাঁর অন্তরে সুন্নাতের বড়ত্ব, মাহাত্ম্য ও মহিমা কত ছিল, আমাদের মতো দুর্বলদের পক্ষে তার আন্দাজ করাও মুশকিল। সুন্নাতের অনুসরণের চেয়ে তাঁর কাছে প্রিয় বস্তু আর কিছুই ছিল না। তার একটা সামান্য নমুনা পেশ করছি। তিনি সারা জীবন লুঙ্গি পরিধান করেছেন। সাথে সাথে এটাও বলতেন, পায়জামা পরিধান করা উত্তম। কিন্তু যেহেতু রাসূল (সা.) সারা জীবন লুঙ্গি পরিধান করতেন, সে জন্য আমার পছন্দও সেটাই। অর্থাৎ, উত্তম যেটাই হোক না কেন, আমার প্রিয় হলো সেটাই, যা আমার রাসূল (সা.)-এর প্রিয় ছিল।

তিনি সত্যকথনে কাউকেই পরোয়া করতেন না। নিজের মতের ওপর তিনি অটল ও অবিচল থাকতেন। তাঁর ঈমানদারসুলভ দূরদর্শিতা ছিল এক কথায় আশ্চর্যজনক। তাঁর একটি ঘটনা শোনাচ্ছি। হযরতের সাহেবজাদাদ্বয়ের (মুফতী আরশাদ রহমানী ও মুফতী শাহেদ রহমানী) আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাঁরা বিশ্বের দ্বীনি শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র দারুল উলূম দেওবন্দে পড়ালেখা করবেন। তাঁরা যখন তাঁদের শ্রদ্ধেয় পিতার সামনে এই আবেদন করলেন তখন হযরতওয়ালা (রহ.) পরিষ্কার ভাষায় বলে দিলেন, যদি বৈধ পদ্ধতিতে স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে দেওবন্দে যেতে পারো তাহলে আমি সানন্দে তার অনুমতি দিচ্ছি। অবৈধ পদ্ধতিতে দেওবন্দে লেখাপড়ার অনুমতি নেই। উপদেশ শ্রবণ করে উভয় সাহেবজাদা (যাঁরা বর্তমানে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে তাঁদের মরহুম পিতার মতোই দ্বীনের খেদমতে ব্যাপৃত আছেন) পাকিস্তানের দারুল উলূম করাচি থেকে লেখাপড়া সমাপ্ত করেন। আল্লাহ তাঁদেরকে পিতার মতোই দ্বীনের জন্য কবুল করুন এবং তাঁদের ইলমে আমলে বরকত দান করুন।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! এগুলো তাঁর উজ্জ্বল বর্ণাঢ্য কর্মমুখর জীবনের সংক্ষিপ্ত চিত্রায়ণ মাত্র। অন্যথায় তাঁর জীবনের প্রতিটি দিকই এটার উপযুক্ত যে সেগুলোকে স্বর্ণাক্ষরে লিখে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করা। বাস্তব কথা হলো, হযরতওয়ালা (রহ.)-এর দুঃখজনক মৃত্যুতে কেবল বাংলাদেশের মুসলমানরাই শুধু একজন অভিভাবক হারাল তা নয়, বরং পুরো উপমহাদেশের মুসলমানরা বঞ্চিত হলো একজন দরদি মুরব্বির সুশীতল ছায়া থেকে। হাদীসে সদকায়ে জারিয়ার যে তিনটি পদ্ধতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে একটু সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাই যে, মুফতী সাহেব (রহ.) প্রত্যেক পন্থায় সফলতার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন। এ ধরনের সৌভাগ্য কয়জনের হয়? আল্লাহ তা'আলা হযরত মুফতী সাহেব (রহ.)-কে নিজের মহান শান অনুযায়ী উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন। হযরতওয়ালা (রহ.)-এর মৃত্যুর দুঃখজনক সংবাদ ছাবীলুল হুদা মাদরাসায় পৌঁছার সাথে সাথে মাদরাসার শিক্ষক, কর্মচারী এবং ছাত্রদের মাঝে শোকের ছায়া নেমে আসে। পরের দিন বুধবার ফজরের পর মাদরাসায় সম্মিলিতভাবে ঈসালে সওয়াবের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়।

আল্লাহ তা'আলা হযরতওয়ালা (রহ.)-কে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চাসনে সমাসীন করুন এবং উত্তরসূরিদেরকে তাঁর পদাঙ্ক যথাযথ অনুসরণ করার তাওফিক দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন

বিন্যাস ও অনুবাদ : মুফতী রিদওয়ানুল কাদির
শিক্ষক, জামিয়াতুর আবরার কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)-এর ইন্তেকালে জাতি একজন দরদি ও দূরদর্শী অভিভাবক হারাল

মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক্ব

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)। তিনি ছিলেন এ দেশের উলামায়ে কেরামের মুরব্বি। উলামায়ে কেরামের জন্য ছিলেন এক সুবিশাল ছাতা। ফেতনা-ফ্যাসাদের ঝড়ঝাপ্টা থেকে তিনি তাদেরকে যথাসাধ্য আগলে রাখার চেষ্টা করে গেছেন। এ ক্ষেত্রে অনেকে তাঁকে ভুলও বুঝেছে। পেয়েছেন বিস্তর দুঃখ-কষ্ট। কিন্তু সব কিছুকে উপেক্ষা করে তিনি ছিলেন আপন কর্তব্যে অটল-অবিচল।

অনন্য বৈশিষ্ট্য

ফেতনা-ফ্যাসাদকে তিনি অঙ্কুরেই চিহ্নিত করতে পারতেন। সবার কাছে স্পষ্ট হওয়ার আগেই তিনি তা অনুধাবন করতে পারতেন। ফেতনার আভাস পাওয়া মাত্রই আলেম সমাজকে সতর্ক করতে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতেন। এ উদ্দেশ্যে দ্রুততম সময়ে সেমিনার আহবান করতেন। সবার ডাকে তো আর সবাই আসে না। কিন্তু তাঁর আহ্বানে এ

দেশের আলেম সমাজ স্বতঃস্ফূর্ত লাব্বাইক বলতেন। ফেতনায়ে আহলে হাদীসসহ এ ধরনের কয়েকটি সেমিনারে আমারও অংশগ্রহণের সৌভাগ্য হয়েছে। আগত উলামায়ে কেরামের মেহমানদারী ও যাতায়াত-ব্যয়ের যাবতীয় খিদমতও তিনি সানন্দে আঞ্জাম দিতেন। এটা ছিল সময়ের বিবেচনায় অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও ব্যয়বহুল কাজ, যা তিনি স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিতেন। এসব ঝক্কি-ঝামেলা তিনি বইতেও পারতেন খুব সহজে। এটা এই জমানায় তাঁর একক বৈশিষ্ট্য। বর্তমানে এর নজির নেই।

তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়

তিনি পটিয়া ছেড়ে ঢাকায় আসার কয়েক বছর পর। জামি'আ রাহমানিয়ার শায়খুল হাদীস, উস্তাদে মুহতারাম আল্লামা আজিজুল হক (রহ.) সে বছর রমাজানে উমরায় গিয়েছিলেন। রমাজানের পর তাঁর ফিরতে বিলম্ব হচ্ছিল। এ জন্য নতুন শিক্ষাবর্ষের সবক উদ্বোধন করতে মুফতী আব্দুর রহমান সাহেবকে দাওয়াত দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট দিনে তিনি জামি'আয় আগমন করেন। তখনই তাঁকে আমার প্রথম দেখা। ইতিপূর্বে তাঁর সম্পর্কে আমার তেমন জানাশোনা ছিল না। তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের ঘটনাটি এখনো আমার স্মৃতিপটে সমুজ্জ্বল। তিনি নাম ধরে আমাকে খুঁজছিলেন। আমি এগিয়ে যেতেই বললেন, 'রমাজানে হারদূয়ীর হযরতের ওখানে ছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, ঢাকার মুফতী মনসূরুল হক্বকে চিনি কি না? হযরতকে বলেছি, আমি ঢাকায় নতুন এসেছি, ঢাকার উলামায়ে কেরামের সঙ্গে এখনো

পরিচিত হতে পারিনি, ইনশাআল্লাহ তাঁকে খুঁজে নেব। হযরত আমাকে আপনাদের সঙ্গে জুড়ে-মিলে দাওয়াতুল হক্বের কাজ করতে বলেছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাকে পেয়ে গেলাম।' মহববতপূর্ণ সেই প্রথম সাক্ষাৎটিই তাঁর সঙ্গে আমার নিবিড় সম্পর্ক তৈরি করে দিয়েছিল। এর পর থেকে আমৃত্যু সেই সম্পর্ক অমলিন ও অটুট ছিল।

ইলমী মাকাম ও খিদমত

১৯৫১ সালে দারুল উলূম দেওবন্দের ইফতা বিভাগে খণ্ডকালীন সহকারী মুফতীর দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের শুরু হয়। দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী পটিয়া মাদরাসায় সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। অতঃপর যোগ্যতা ও দক্ষতাবলে পর্যায়ক্রমে পটিয়া মাদরাসার শিক্ষাসচিব, শায়খুল হাদীস ও সহকারী মহাপরিচালক পদে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিশেষ কিছু কারণে নিজে ইস্তেফা দিয়ে পটিয়া থেকে ঢাকায় চলে আসেন। মাঝে পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক মুফতী আজিজুল হক (রহ.)-এর নির্দেশে দীর্ঘ আট বছর (১৯৬০-১৯৬৮ খ্রি.) বৃহত্তর উত্তরবঙ্গে দ্বীনি পরিবেশ কায়েমের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর এ সময়ের সুকঠিন মেহনতের অন্যতম ফসল ঐতিহ্যবাহী জামিল মাদরাসা, বগুড়া। ঢাকায় আসার পর ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন উচ্চতর দ্বীনি গবেষণা প্রতিষ্ঠান–মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী (ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার)। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার কেরানীগঞ্জের বসুন্ধরা রিভারভিউ প্রকল্পে প্রতিষ্ঠা করেন পূর্ণাঙ্গ দাওরায়ে হাদীস

মাদরাসা–জামি'আতুল আবরার। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে ইসলামিক ফিন্যান্সের ওপর প্রতিষ্ঠা করেন স্বতন্ত্র গবেষণা প্রতিষ্ঠান–সেন্টার ফর ইসলামিক ইকোনমিকস বাংলাদেশ। মদীনাতুল উলূম বসুন্ধরা এবং আশরাফিয়া মাদরাসা গাজীপুর নামে আরো দুটি প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন তাঁর হাতে হয়। সব মিলিয়ে ঢাকাতেই তাঁর পরিচালনাধীন মাদরাসা পাঁচটি। এ ছাড়া বগুড়া জামিল মাদরাসা, চট্টগ্রামের শুলকবহর জামি'আ মাদানিয়া, ফটিকছড়ির রহমানিয়া মাদরাসা তিনি সরাসরি নিজেই পরিচালনা করতেন। এগুলো ছাড়াও তিনি ছিলেন এ দেশের শতাধিক মাদরাসার উপদেষ্টা ও মুরব্বি। এ সকল খিদমতই তাঁর ইলমী যোগ্যতা ও পরিচালনা-দক্ষতার সমুজ্জ্বল নিদর্শন।

হযরত হারদূয়ী (রহ.)-এর দরবারে

ইলমে যাহেরের পাশাপাশি ইলমে বাতেন হাসিলেও তিনি ছিলেন অগ্রগামী। দারুল উলূম দেওবন্দে অবস্থানকালীন কুতবুল আলম, শায়খুল হাদীস হযরত যাকারিয়া (রহ.)-এর সোহবত লাভে ধন্য হন। কুতবুল আলম (রহ.) তাঁকে এবং নিজ সন্তান মাওলানা তালহা দা.বা.-কে একসঙ্গে বিশেষভাবে যিকিরের হালকায় বসাতেন। অতঃপর থানভী-বাগানের সর্বশেষ ফুল হযরত হারদূয়ী (রহ.) তাঁকে প্রথম সফরেই খিলাফত প্রদান করেন। এটা ছিল বিচক্ষণ শায়খ হযরত হারদূয়ীর ইতিহাসে বিরল ঘটনা। তাঁর দূরদৃষ্টি ঠিকই যোগ্য ব্যক্তিকে চিনে নিয়েছিল। আর কেনই বা চিনবে না, তাঁর মতো অমন করে আর কয়জন পেরেছে শায়খের জন্য 'ফিদা' হতে?

একবারের ঘটনা। শায়খ হারদূয়ী কোনো এক ব্যাপারে ফকীহুল মিল্লাতকে ডেকেছিলেন। বহুদিনের অভ্যাসবশত তাঁর মুখে তখন পান ছিল। পানমুখে শায়খের সামনে কিভাবে যাবেন এ জন্য মুখ পরিষ্কার করতে কিছুটা দেরি হয়ে গেল। পানের কারণে শায়খের ডাকে সাড়া দিতে বিলম্ব হলো–এই আক্ষেপে শায়খ-অনুরাগী ফকীহুল মিল্লাত পান খাওয়ার অভ্যাসই ত্যাগ করলেন।

তাকওয়া-তাহারাত

শুনেছি, বিশেষ কিছু কারণে তাঁর আর তখন পটিয়া মাদরাসায় থাকা সম্ভব ছিল না। তিনি পটিয়া ছেড়ে ঢাকায় আসার সিদ্ধান্ত নেন। তখন পটিয়ার তৎকালীন দায়িত্বশীলগণকে তিনি বলেছিলেন, আপনারা দৈনিক পত্রিকায় এ মর্মে বিজ্ঞাপন প্রচার করুন যে, 'মুফতী আব্দুর রহমান সাহেবকে পটিয়া মাদরাসার সকল দায়দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। অতএব সংশ্লিষ্ট সকলকে তাঁর সঙ্গে পটিয়া মাদরাসার কোনো লেনদেন না করার জন্য অনুরোধ করা গেল।' তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী পটিয়া কর্তৃপক্ষ তা-ই করেছিল। মূলত এটা ছিল হযরতের তাকওয়া-তাহারাত ও দ্বীনি সতর্কতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নচেৎ দেশ-বিদেশের বহু সম্পদশালী ব্যক্তিবর্গ তাঁকে অত্যন্ত মহব্বত করতেন। এ সকল সম্পদশালী ব্যক্তিবর্গ পূর্বসম্পর্কের ভিত্তিতে তাঁকে পটিয়ার প্রতিনিধি মনে করে টাকা-পয়সা পাঠানোর সম্ভাবনা ছিল, যা পরবর্তীতে বিতর্ক জন্ম দিত। এসব দাতার সংখ্যা অধিক হওয়ায় হযরতের পটিয়ায় না থাকার বিষয়টি সকলকে অবহিত করতে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছাপানোর বিকল্প ছিল না।

তাওয়াক্কুল ও লিল্লাহিয়াত

তিনি একেবারে শূন্য হাতে পটিয়া থেকে ঢাকায় আগমন করেন। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে দেশবরেণ্য উলামায়ে কেরাম ও দেশি-বিদেশি মুরব্বিয়ানে কেরামের পরামর্শে বসুন্ধরায় ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার নামে একটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন করেন। এ প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক ও উপদেষ্টা ছিলেন তাঁর শায়খ মুহিউস সুন্নাহ শাহ আবরারুল হক হারদূয়ী (রহ.)। হযরত হারদূয়ী শর্ত দিয়েছিলেন, তাঁকে এ প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক রাখতে হলে এখানে গণচাঁদা তোলার ব্যবস্থা থাকতে পারবে না। বেশির চেয়ে বেশি আম মজমায় মাদরাসার জরুরতের কথা তুলে ধরে সকলের কাছে দু'আ চাইতে পারবেন। কিন্তু কিছুতেই ব্যক্তি নির্দিষ্ট করে চাঁদা কালেকশন করা যাবে না। ফকীহুল মিল্লাত শায়খের দেওয়া শর্ত আজীবন মেনে চলেছেন। একবার মাদরাসায় প্রচণ্ড রকম আর্থিক টানাপড়েন দেখা দিলে তিনি শায়খের কাছে গণচাঁদার অনুমতি চেয়েছিলেন। তখন হযরত হারদূয়ী বলেছিলেন, 'করতে পারেন, কিন্তু আমাকে পৃষ্ঠপোষক রেখে নয়।' সেই পিঠ বাঁকানো অনটনের মধ্যেও শায়খের অনড়তাকে তিনি হাসিমুখে সম্মান জানাতে পেরেছিলেন। শায়খ হারদূয়ীও তাঁকে নিরাশ করেননি। প্রিয় খলিফাকে মালের পরিবর্তে আমলের পথ প্রদর্শন করেছিলেন। বলেছিলেন, আপনার মাদরাসায় খতমে খাজেগানের আমল চালু করে দিন। নিয়মিত এই খতম জারি রাখুন, ইনশাআল্লাহ কোনো

অভাব-অনটন থাকবে না। ভক্ত-মুরীদ শায়খের বাতানো পথে সত্যি সত্যিই অভাব-অনটনকে জয় করতে পেরেছিলেন। সারা জীবন কখনো তাঁকে গণচাঁদার দ্বারস্থ হতে হয়নি।

দুনিয়া বিমুখতা

আল্লাহ তা'আলা হযরতের মধ্যে বিস্ময়কর আকর্ষণ রেখেছিলেন। উলামায়ে কেরাম তো বটেই, দেশের বড় বড় শিল্পপতিগণও তাঁর সান্নিধ্যে কিছু সময় কাটাতে পারাকে সৌভাগ্য জ্ঞান করতেন। বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান জনাব আলহাজ আহমেদ আকবর সোবহান সাহেব তাঁর জানাযার পূর্বে যেভাবে কেঁদেছেন, তাঁর প্রতি ভক্তি প্রকাশ করেছেন, তাতে উপস্থিত সকলেই বিস্মিত হয়েছেন। এমন বহু মুহিব্বীন তাঁর জন্য কুরবান ছিলেন। আল্লাহর বান্দা তাঁদের থেকে দ্বীনি খিদমত ছাড়া ব্যক্তিগত কোনো ফায়দা হাসিল করেননি। চেষ্টারও দরকার ছিল না, ইঙ্গিত পেলেই এসব 'আহলে খায়র' ভাইয়েরা তাঁর জন্য ঢাকা শহরে কয়েকটি বাড়ি করে দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তা ছাড়া তিনি যে সময় ঢাকায় এসেছেন, বসুন্ধরার প্রায় পুরোটাই তখন সারা বছর পানির নিচে থাকত। তাঁর সামনেই বসুন্ধরা জলাশয় ঢাকার হাই সোসাইটিতে পরিণত হয়েছে। ইচ্ছে করলে কারও সহায়তা ছাড়াই তিনি সে সময় ঢাকা শহরে ২-১ বিঘা জমির মালিক হতে পারতেন। কিন্তু ঢাকা শহরে না তাঁর কোনো বাড়ি আছে, আর না আছে প্লট-ফ্ল্যাট। এমন দুনিয়াবিমুখ মানুষ এখন খুব একটা দেখা যায় না।

দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত এবং উম্মতের প্রতি তাঁর দরদ-ব্যথা

উম্মতের জনসাধারণের জন্যও তাঁর দিলে অপরিসীম দরদ ছিল। তাঁর মধ্যে এ দরদ ব্যথা সঞ্চারিত হয়েছিল হযরতজি ইউসুফ সাহেব (রহ.)-এর মুবারক সান্নিধ্যে। তিনি হযরতজির সঙ্গে পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘ সময় দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতে সময় লাগিয়েছিলেন। ফকীহুল মিল্লাতের মাদরাসা হতে বিশ্ব ইজতিমাসহ তাবলীগ জামাআতের বিভিন্ন প্রোগ্রামে ছাত্ররা নিয়মিত অংশগ্রহণ করে থাকে। মাদরাসার মসজিদে জামাআত এলে তিনি সাথীদের খোঁজখবর নিতেন। তাদেরকে ভরপুর মেহমানদারী করাতেন। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের ৭-৯ই নভেম্বর কক্সবাজারে তাবলীগি ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমবার হওয়াতে ব্যবস্থাপনাগত কিছু ত্রুটির কারণে আগত মুসল্লীদের খাবার পানির তীব্র সঙ্কট দেখা দেয় এবং প্রচণ্ড গরমে তাদের কষ্ট হতে থাকে। ফকীহুল মিল্লাত সংবাদ পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে নিজ উদ্যোগে মুসল্লীদের জন্য পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি ও বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। এ ছাড়া আর্তমানবতার সেবায় এবং উম্মতের দুর্যোগ-দুর্দশায়ও তিনি সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যেতেন। ১৯৯১ এর ২৯ এপ্রিল উপকূলীয় অঞ্চলে আঘাত হানা প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পর, একই বছর আরাকানি শরণার্থী শিবিরে, ১৯৯৪-এ টেকনাফ-কক্সবাজারের ঘূর্ণিঝড়ের পর, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে সিডর আক্রান্ত এলাকায়, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে টর্নেডোকবলিত বাক্ষণবাড়িয়ায় এবং অন্যান্য জাতীয় দুর্যোগে আর্তমানবতার সেবায় তিনি যে ব্যাপক ত্রাণ-কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন তা অবিস্মরণীয়। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম ও মেহনত-মুজাহাদার মাধ্যমে একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন, যা ফকীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন নামে পরিচিত। ফাউন্ডেশনটি প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে আজ অবধি নিরলসভাবে অনাথ-এতীম, অসহায়-বিধবা, দুস্থ-দরিদ্র ও সহায়-সম্বলহীনদের মাঝে আর্থসামাজিক ও ধর্মীয় সেবা প্রদান করে আসছে।

দাওয়াতুল হক ও ফকীহুল মিল্লাত

হযরত থানবী (রহ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং হযরত হারদূয়ী কর্তৃক ব্যাপকতাপ্রাপ্ত মজলিসে দাওয়াতুল হক বাংলাদেশ-এর তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা এবং গুলশান থানার সম্মানিত আমীর। দাওয়াতুল হকের বহু গুরুত্বপূর্ণ মশওয়ারা তাঁর প্রতিষ্ঠিত বসুন্ধরা ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। দাওয়াতুল হকের মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাতসমূহের প্রচার-প্রসার ছিল তাঁর জীবনের পরম লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। এ জন্য তিনি আজীবন মেহনত-মুজাহাদা অব্যাহত রেখেছেন।

তাঁর এবং দাওয়াতুল হকের আমীরুল উমারা মাওলানা মাহমূদুল হাসান সাহেব দা.বা.-এর মধ্যে অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। আমীরুল উমারা সাহেবও বহুবার তাঁর মাদরাসায় দাওয়াতুল হকের মশওয়ারা করেছেন এবং বসুন্ধরায় দাওয়াতুল হকের ইজতিমায় বয়ান রেখেছেন। তিনিও দাওয়াতুল হকের বার্ষিক ইজতিমাসহ বিভিন্ন উপলক্ষে বহুবার যাত্রাবাড়ী মাদরাসায় গমন করেছেন এবং প্রবীণ মেহমান হিসেবে

সেখানে বক্তব্য রেখেছেন। হযরতের জানাযায় শরীক হয়ে আমীরুল উমারা বলেছিলেন, 'আজ আমি আমার মুরব্বি ও অভিভাবককে হারালাম।'

ইন্তেকালের কয়েক দিন পর তাঁর দুই সাহেবজাদাকে সান্ত্বনা দিতে আমীরুল উমারা সাহেব বসুন্ধরা মাদরাসায় গমন করেন। এ সময় তিনি হযরতের পুত্রদ্বয়কে বলেছেন, 'যদি কখনো কোনো অসুবিধায় পড়ো–চাই তা যে ধরনেরই হোক না কেন এবং মনে করো যে আমার দ্বারা তোমাদের উপকার হবে–নির্দ্বিধায় জানিয়ো, আমি তা আঞ্জাম দিতে প্রস্তুত আছি।' আমীরুল উমারার এই মুখলিসানা তা'যিয়াত থেকে দুই হযরতের মহববতানা তাআল্লুক আন্দায করা যায়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের মুরব্বিদের হায়াতে আরো বরকত দান করুন।

কওমী মাদরাসার সরকারি স্বীকৃতির প্রশ্নে হযরতের অবস্থান

কওমী মাদরাসার সরকারি স্বীকৃতির দাবিতে একদল উলামায়ে কেরাম তখন ময়দানী আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এমনই সময়ে তিনি তাঁর শায়খের সান্নিধ্যে ভারতের হারদূয়ীনগরে গমন করেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে তিনি সরকারি স্বীকৃতির বিষয়টি শায়খের কাছে তুলে ধরেন এবং এ ব্যাপারে তাঁর মতামত জানতে চান। শুনে হযরত হারদূয়ী (রহ.) বলেছিলেন, 'বিলকুল নেহী, ইস্‌সে তালিবে ইলম কি আখলাক বিগ্যড় যায়েগী' (কওমী মাদরাসার সরকারি স্বীকৃতির কোনো প্রয়োজন নেই। এতে ছাত্রদের আখলাক-চরিত্র বিনষ্ট হবে।) তখন ফকীহুল মিল্লাত তাঁকে বলেছিলেন, দেশে ফিরে গিয়ে এ কথা বললে লোকে আমাকে পাগল বলবে। জবাবে হযরত হারদূয়ী (রহ.) বলেছিলেন, তাই বলে কি হক্ব কথা বলা ছেড়ে দিতে হবে? অনুরূপভাবে হযরত আসআদ মাদানী (রহ.)-এর সঙ্গেও তিনি এ ব্যাপারে মতবিনিময় করেন। হযরত মাদানী (রহ.) তাঁকে বলেছিলেন, 'ভারত সরকার স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আমাদেরকে বারবার আহ্বান করছে। আমরা এর পরিণতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়ায় সব সময়ই তা এড়িয়ে যাচ্ছি এবং তাদেরকে বলছি, ভাই, আমরা এভাবেই ভালো আছি। দয়া করে আমাদেরকে আমাদের মতোই থাকতে দিন। কাজেই আপনারাও এর ধারেকাছে যাবেন না।'

দেশে ফেরার পর ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) নিজে আমাকে এ ঘটনা শুনিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে শায়খের মতামতই তাঁর মতামত বলে ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য পরবর্তীতে তিনি হাটহাজারী মাদরাসার সম্মানিত মুহতামিমসহ অন্যান্য উলামায়ে কেরামের পীড়াপীড়িতে এই মত থেকে কিছুটা সরে এসেছিলেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব মতামত কতটা প্রতিফলিত হয়েছিল, আর কতটা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের সঙ্গদান ও মনরক্ষার ব্যাপার–তা বোঝা কঠিন নয়।

যে ইহসান ভোলার নয়

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) ছিলেন আমার খাছ মুরব্বি। ২০০১ খ্রিস্টাব্দে রাহমানিয়া ভবন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর আমার কতিপয় হিতাকাঙ্ক্ষী উস্তাযে মুহতারাম শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক (রহ.)-এর নিকট আমার বুখারীর সনদ বাতিলের আবেদন জানায়। যদ্দুর শুনেছি–শায়খুল হাদীস (রহ.) বলেছিলেন, 'আমি ওদেরকে দুনিয়াতে হারিয়েছি, এখন এটা করে আখেরাতেও ওদেরকে হারাতে চাই না।' সংবাদটি আমার জন্য সান্ত্বনাপ্রদ হলেও পুরোপুরি স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। আশঙ্কা ছিল, শায়খ (রহ.) না চাইলেও তাঁর বার্ধক্যজনিত কমযোরির সুযোগ নিয়ে হিতাকাঙ্ক্ষিরা বহু ব্যাপারের মতো এ ব্যাপারেও তাঁকে বাধ্য করতে পারে। তো কোনো এক সুযোগে আমি এ বিষয়ে ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর সঙ্গে আলোচনা করি এবং আমার আশঙ্কার কথা জানাই। সেই অস্বস্তিকর সময়ে তাঁর স্নেহপূর্ণ সদয় আচরণ আমাকে বড় স্বস্তি দান করেছিল। আমি কথা শেষ করতেই তিনি বলেছিলেন, 'মাওলানা! ঘাবড়াবেন না, তেমনটি হলে আপনি আমার সনদে বুখারী পড়াবেন। আমি এখনই আপনাকে বুখারীর ইজাযত দিয়ে দিচ্ছি।' এ কথা বলে তিনি বুখারী শরীফ আনিয়ে নিজে একটি হাদীস পড়লেন আর আমাকে দিয়ে আরেকটি হাদীস পড়ালেন। সেই সঙ্গে নিজের সনদ বর্ণনা করে ফিকহ এবং ইফতারও ইজাযত প্রদান করলেন। পরবর্তীতে তিনি বাতিলের বিরুদ্ধে লেখালেখি ও বয়ানের ইজাযতও আমাকে প্রদান করেছেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত আমার সে আশঙ্কা বাস্তব হয়নি। তা সত্ত্বেও এর পর থেকে আমি বরকত মনে করে উস্তাদে মুহতারাম শায়খুল হাদীস (রহ.)-এর পাশাপাশি ফকীহুল মিল্লাতের সনদও বয়ান করি।

আল-আবরারের সঙ্গে আমার সম্পৃক্ততা

বাংলা ভাষায় ইসলামের খিদমতের উদ্দেশ্যে তিনি কয়েক বছর আগে

'আল-আবরার' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। পত্রিকা প্রকাশের কিছুদিন পর হযরতের বিশ্বস্ত ও আমার বহু বছরের পুরনো বন্ধু ভাই আলহাজ শাহ মুহাম্মাদ নূরুল গনি সাহেবের মাধ্যমে তিনি আমাকে আল-আবরারে নিয়মিত লিখতে অনুরোধ করেন। হযরতের নেকনজর লাভের উদ্দেশ্যে আমি তখন থেকেই আল-আবরারে নিয়মিত লেখা পাঠাই। আমার কলামটির 'সীরাতে মুস্তাকীম' নামটিও তিনি নিজে চয়ন করে দিয়েছিলেন। এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন সময়ে বগুড়া জামিল মাদরাসাসহ বিভিন্ন স্থানে আমাকে বয়ান করতে পাঠিয়েছেন। ইন্তেকালের কিছুদিন আগে কক্সবাজারের উলামায়ে কেরাম আয়োজিত 'আহলে হাদীসের মুখোশ উন্মোচন' শীর্ষক মাহফিলে তিনি প্রধান অতিথি ছিলেন। প্রচণ্ড অসুস্থতার কারণে তাঁর পক্ষে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তিনি সেখানেও তাঁর নায়েব হিসেবে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে তিনি রংপুর জুমাপাড়া দাওরা হাদীস মাদরাসায় আহলে হাদীসবিরোধী বিরাট সম্মেলনে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে সরাসরি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং সফরের কারগুযারী শোনাই। শুনে তিনি অত্যন্ত খুশি প্রকাশ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা হযরতের সকল খিদমতকে তা-কিয়ামত কায়েম ও দায়েম রাখুন। আমাদের সম্পর্কে তিনি যে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন তার হক্ব আদায়ের তাওফীক দান করুন। আমীন।

তিনি ছিলেন আশেকে কোরআন

তিনি কোরআনে কারীমের কত বড় আশেক ছিলেন তা তাঁর হারদূয়ী অবস্থানকালীন ঘটনা দ্বারা অনুমান করা যায়। তিনি ব্যক্তিগতভাবে ক্বারী ছিলেন। এমনকি দারুল উলূম দেওবন্দে পড়ার সময় তিনি দারুল উলূমের মসজিদের ইমাম ছিলেন। সকলেই তাঁর তেলাওয়াত পছন্দ করতেন। এতদসত্ত্বেও তিনি যখন শায়খের দরবারে হারদূয়ী যেতেন, তখন সেখানে বৃদ্ধ বয়সেও কোরআনে কারীমের মশক করতেন। তিনি এতে মোটেও লজ্জাবোধ করতেন না। বসুন্ধরায় অবস্থানকালে তাঁকে বহুবার দেখেছি, শত ব্যস্ততার মাঝে যখনই একটু সময় পেতেন কোনো হাফেয তালিবে ইলমকে ডেকে তেলাওয়াত শুনতে থাকতেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কবরকে কোরআনে কারীমের নূর দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিন। আমীন।

জামি'আ রাহমানিয়ার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক

তিনি ছিলেন জামি'আ রাহমানিয়ার দুর্যোগকালীন সময়ে আহলে শুরার ছদর অর্থাৎ সভাপতি। রাহমানিয়া যেন কিছুতেই বে-উসূলির শিকার না হয় সে জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। আল্লামা আহমদ শফী দা.বা. ও মুফতী মাহমূদুল হাসান দা.বা.-সহ দেশের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরামকে নিয়ে বারবার মশওয়ারা করেছেন। কিন্তু অবশেষে তা-ই হয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলার মর্জি ছিল। অতঃপর যখন জামি'আ রাহমানিয়া তার ভবন ছেড়ে টিনশেডে স্থানান্তরিত হলো, তখনও তিনি ছিলেন আমাদের মুরব্বি। বয়স ও বার্ধক্যের মজবুরী সত্ত্বেও তিনি রাহমানিয়ায় ছুটে এসেছেন। আসাতিযা ও তালিবে ইলমদেরকে সান্ত্বনা দিয়েছেন, দু'আ করেছেন। জামি'আ রাহমানিয়া তাঁর আপদকালীন সময়ের এ মহান মুহসিনকে কোনো দিনই ভুলবে না।

শেষ কথা

মানুষ দুনিয়াতে চিরদিন থাকার জন্য আসে না। নিজের আখেরাত সাজানোর জন্যই তার এখানে আগমন। তবে অসাধারণ মানুষেরা জাতির জন্য রেখে যান কল্যাণের অফুরান ধারা। ফকীহুল মিল্লাত ছিলেন একজন অসাধারণ মানুষ। নিয়ম অনুযায়ী তিনিও আখেরাতের ঘরে চলে গিয়েছেন। তবে তার আগে সাজিয়ে নিয়েছেন নিজের স্থায়ী আবাস। আর আমাদের জন্য রেখে গেছেন এক আদর্শ জীবন। মাঝেমধ্যে দু-একটা স্মরণসভা করেই তাঁর আলোকিত জীবনের ব্যাপ্তি আত্মস্থ করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন কিছু মানুষের ফকীহুল মিল্লাত বনে যাওয়া। আমি লকব বা উপাধির কথা বলছি না। বলছি, তাঁর অসামান্য গুণাবলি ও জাতির জন্য তাঁর অবিস্মরণীয় অবদানের কথা। তাঁর সেসব গুণাবলি নিজেদের জীবনে ধারণ করেই আমরা তাঁর আত্মাকে পরিপূর্ণ শান্তি পৌঁছাতে পারি। আমার এ কথার লক্ষ্য শুধু তাঁর নায়েবগণই নন, যাঁরা তাঁকে ভালোবাসেন তাঁদের সকলের কাছেই আমার এ আবেদন। আল্লাহ তা'আলা তিনিসহ আমাদের সকল আকাবিরের কবরকে নূর দ্বারা পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে তাঁর ও তাঁদের ফয়েয ও বারাকাত সর্বাধিক উপযোগী পন্থায় অর্জন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

লেখক : শায়খুল হাদীস ও প্রধান মুফতী, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা।
বিশিষ্ট খলিফা, মুহিউস সুন্নাহ মাওলানা শাহ আবরারুল হক (রহ.)

আমার স্মৃতিতে হযরত ফকীহুল মিল্লাত রহ.

মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব পরিণত বয়সেই আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন। তাঁর প্রতি সমকালীন আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ভক্তি-শ্রদ্ধা এবং রাজধানীর বুকে (বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায়) তাঁর জানাযার নামাযে এত বিপুল উপস্থিতি তাঁর মকবুলিয়্যাতেরই প্রমাণ বহন করে। খলীফায়ে থানভী হযরত শাহ আবরারুল হক হারদুঈ (রহ.) এর এজাযতপ্রাপ্ত হয়ে হযরত ফকীহুল মিল্লাত এক নতুন উচ্চতা স্পর্শ করেছিলেন। বিশেষ করে জন্মভূমি চট্টগ্রাম ছেড়ে রাজধানীতে একপ্রকার হিজরত করার পর থেকেই মূলত তাঁর জীবনের ফুতুহাত তথা চূড়ান্ত বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। মুফতী সাহেব হুজুরের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে জানতে হলে নিচের ক'টি লাইন পড়ে নেওয়াই যথেষ্ট।

গত ১০ নভেম্বর ২০১৫ ঈ. মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটে ঢাকার বারিধারাস্থ বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় অবস্থিত মাদরাসায় তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। তিনি এক মেয়ে, দুই ছেলে, নাতি-নাতনি ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

পরদিন বুধবার সকাল ১০টায় বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় অবস্থিত বড় মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। পরে বসুন্ধরা 'এন' ব্লকে নির্মিতব্য বসুন্ধরা সেন্ট্রাল মসজিদসংলগ্ন কবরস্থানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়।

ফকীহুল মিল্লাত দীর্ঘদিন ধরে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের শরিয়া বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। ২০০৮ সালে তিনি শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের শরিয়া বোর্ডেরও চেয়ারম্যান মনোনীত হন। দীর্ঘদিন তিনি সেন্ট্রাল শরিয়া বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস-এর চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ফকীহুল মিল্লাত মুফতি আব্দুর রহমান ১৯২২ সালে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার ইমামনগর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম চাঁন মিয়া। তিনি নাজিরহাট বড় মাদরাসা ও জামিয়া আহলিয়া মঈনুল ইসলাম হাটহাজারীতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক লেখাপড়া সমাপ্ত করেন। ১৯৫০ সালে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে কওমি মাদরাসা পাঠ্যক্রমের সর্বোচ্চ স্তর দাওরায়ে হাদিস কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করেন। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের ইফতা বিভাগের প্রথম আনুষ্ঠানিক সনদপ্রাপ্ত মুফতি।

ফকীহুল মিল্লাত মুফতি আব্দুর রহমান ১৯৬০ সালে উত্তরবঙ্গে গমন করেন। তিনি ওয়াজ-নসিহত, দীনি শিক্ষাদীক্ষা ও আদর্শ বিস্তারে স্বকীয় গুণবলে উত্তরবঙ্গের জনপদে ইসলামী আদর্শ ও শিক্ষার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটাতে সক্ষম হন। তিনি বহু মসজিদ, মাদরাসা, মক্তব ও হেফজখানা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দেশের উত্তরাঞ্চলীয় প্রায় ১৮টি জেলার সহস্রাধিক দ্বীনি প্রতিষ্ঠান নিয়ে গঠিত তানযীমুল মাদারিস আদ্‌দীনিয়্যা বাংলাদেশের (উত্তরবঙ্গ) সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৬৮ সালে ফকীহুল মিল্লাত জামিয়া পটিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত পুরোদমে জামিয়ার বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। তিনি একাধারে জামিয়ার প্রধান মুফতি, সহকারী মহাপরিচালক ও শিক্ষা বিভাগীয় পরিচালকের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দাওরায়ে হাদিসের সর্বোচ্চ কিতাব বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের পাঠদান করেন।

মুসলিম উম্মাহকে সুদভিত্তিক অর্থনীতি থেকে রক্ষা করা এবং ইসলামী শরিয়াহভিত্তিক অর্থনীতিকে সহজ থেকে সহজ করার মানসে বিভিন্ন কর্মপন্থা তিনি আপন গবেষণা থেকে উপস্থাপন করেন এবং তা বাস্তবায়িতও হয়। ফকীহুল মিল্লাত ইসলামী ব্যাংকের প্রথম শরিয়াহ বোর্ডের সদস্য মনোনীত হন। ইসলামী অর্থনীতির ওপর তাঁর গবেষণালব্ধ বহু কর্মপন্থা ও ফতওয়া ইসলামী ব্যাংকিংকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি মুসলিম উম্মাহর জন্য সুদভিত্তিক অর্থনীতির বিকল্প হিসেবে একটি শরিয়াভিত্তিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়েছে।

আরববিশ্ব তথা দুবাই, বাহরাইন, কাতার প্রভৃতি রাষ্ট্র এবং ভারত, পাকিস্তানসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রে বড় বড় ইসলামী অর্থনৈতিক সেমিনারে তিনি যোগ দিয়েছেন। এসব সেমিনারে ইসলামী অর্থনীতির ওপর তাঁর গবেষণালব্ধ বিভিন্ন প্রবন্ধ সমাদৃত হয়েছে।

ইসলামী অর্থনীতির বহুল চর্চার জন্য তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, বসুন্ধরায় তিনিই সর্বপ্রথম ২০০২ সালে ইসলামী অর্থনীতি ও ইসলামী ব্যাংকিং বিভাগ চালু করেন। বিভাগটি এ পর্যন্ত ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ে

ব্যাপক খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। ইসলামী অর্থনীতিকে এ দেশের মানুষের মধ্যে বিস্তৃতির জন্য বেশ কয়েকবার আন্তর্জাতিক সেমিনারেরও আয়োজন করেন তিনি। ফকীহুল মিল্লাত ১৯৯১ সালে তাঁর শায়খ রহ. এর নেক দু'আ ও সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা এবং দেশের বরেণ্য ওলামায়ে কেরামের পরামর্শক্রমে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ স্থান বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় একটি ব্যতিক্রমধর্মী উচ্চশিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। মুফতি আবদুর রহমান বাংলাদেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম। বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার-প্রসারে তাঁর অসামান্য অবদান রয়েছে। বহু ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হয়।

বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী এ মনীষীর মৃত্যুসংবাদ আমি নিজে জানার পরপরই বর্তমানে দেশের বাড়ি কিশোরগঞ্জে অবস্থানরত আমার আম্মাকে জানাই। তিনি আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে বলেন, কার কথা বলছ? ইনি কি পটিয়ার মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব? আমি তখন বললাম, জী, পটিয়ার। তবে বিগত ২৫ বছর যাবৎ তিনি বসুন্ধরা ঢাকায় ছিলেন। পটিয়া তিনি বহু আগেই ছেড়ে এসেছেন। আম্মা তখন বললেন, তোমার আব্বার কাছে যখন মুফতী সাহেবের কথা শুনেছি তখন তাকে পটিয়ার মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব হিসেবেই চিনেছি। এরপর নতুন প্রজন্মের কাছে তিনি বসুন্ধরার মুফতী সাহেব হলেও আমাদের কাছে পটিয়ারই রয়ে গিয়েছেন। ফোন শেষ করে আমি স্মৃতির দর্পণে মুফতী সাহেব হুজুরকে দেখতে লাগলাম।

আজ থেকে ৩২ বছর আগে আমি তাঁকে জীবনের প্রথম পটিয়া গিয়েই দেখি। তখন ১৯৮৩ ঈ.। কিশোরগঞ্জ জামিয়া থেকে তাকমীল শেষ করার পরপরই পটিয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। আমার সহপাঠী আঠার বাড়ির ফজলুল হক আর আমি সুদূর চট্টগ্রামের পটিয়ায় তাখাসসুস পড়তে যাব। আব্বা পরামর্শ দিয়ে মাওলানা সুলতান যওক সাহেবের কাছে পত্র লিখে দিলেন যেন আমাকে আমার পছন্দ ও রুচি অনুযায়ী কোন বিভাগে ভর্তি করা হয়। মাদরাসায় পৌঁছে দেখি যওক সাহেব হুজুর ছুটিতে বাড়ি গিয়েছেন। হুজুর তখন আনোয়ারায় সপরিবারে থাকতেন। আমি হুজুরের অপেক্ষায় আছি শুনে মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব আমাকে পরদিন সকালে তাঁর অফিসে নাশতার জন্য ডাকলেন। তিনি তখন পটিয়ার নায়েবে মুহতামিম। তিনি তেষট্টি/চৌষট্টি বছর বয়সী প্রবীণ স্বনামধন্য আলেমে দ্বীন আর আমি তার পুত্রের চেয়েও কম বয়সী ষোল/সতের বছরের এক তরুণ। আমি একটি দিন পটিয়ায় মেহমান হিসাবে অপেক্ষা করার সময়েই ছাত্র ও শিক্ষকদের সাথে সৌজন্যমূলক আলাপচারিতার ভেতর দিয়ে মাদরাসার নানান দিক সম্পর্কে মোটামুটি জেনে গিয়েছি। যদিও আমার বয়স তখন নিতান্ত কম। শিক্ষা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নাই বললেই চলে। তথাপি সহজাত কৌতূহল, অনুসন্ধিৎসা ও বিশ্লেষণী শক্তি আমাকে ভাবতে, বুঝতে ও সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

যথারীতি মুফতী সাহেব হুজুরের সহকারী মুফতী শামসুদ্দীন জিয়া ও মাওলানা আব্দুস সবুর আমাকে ফজরের পরপরই হুজুরের দফতরে পৌঁছে দিলেন। আমি সালাম দিয়ে কথাবার্তা শুরুর আগেই মুফতী সাহেব হুজুর আমাকে প্রাণখোলা অভ্যর্থনা করে পরিবেশ সহজ করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আপনার আব্বা বেফাকের সফলতম মহাসচিব হিসাবে আমাদের মুহতামিম হাজী সাহেব হুজুরের খুবই প্রিয় ও আস্থাভাজন। উল্লেখ্য যে, তখন আমার আব্বা খতীবে মিল্লাত হযরতুল আল্লাম মাওলানা আতাউর রহমান খান রহ. বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়ার মহাসচিব এবং পটিয়ার মুহতামিম শাইখুল আরব ওয়াল আজম মাওলানা হাজী মুহাম্মদ ইউনুস রহ. বেফাকের সভাপতি। আমরা সবাই আপনার আববাকে খুব পছন্দ করি। ব্যক্তিগতভাবে আমি চাই আপনার মতো একজন প্রতিভাবান তরুণ আলেম বিশেষভাবে ফিকহ ও ফতোয়া পড়ুন। আগামী দিনে বিচক্ষণ ফকীহ ও গভীর জ্ঞানী মুফতীর খুব প্রয়োজন। আমি তখন যওক সাহেব হুজুরকে লেখা আব্বার পত্রটি মুফতী সাহবে হুজুরকে দেখালাম। কারণ, চিঠিটি যথেষ্ট ব্যক্তিগত ধরণের ছিল না। ছিল অনেকটা প্রত্যয়নপত্রের মতো। মুফতী সাহেব হুজুর তখন বললেন, দেখুন, আপনার আব্বা খুবই বাস্তববাদী ও দূরদর্শী আলেম বলেই চিঠিতে লিখেছেন, আপনার পছন্দ ও রুচি অনুযায়ী কোন বিভাগে আপনাকে ভর্তি করার জন্য। আমি একজন নবযুবক। হুজুর আমাকে আপনি বলে সম্বোধন করায় বেশ বিব্রতবোধ করছিলাম। বললাম, হুজুর, আপনি আমাকে তুমি করে নাম ধরে ডাকলে আমি খুশি হই। হুজুর তখন মুচকি হেসে বললেন, দাওরা পাশ করে এসেছেন তাখাসসুস পড়তে। এখন উবায়দুর রহমান সাহেব বলে ডাকাই উত্তম। আমরা যদি আপনাকে মাওলানা সাহেব, খান সাহেব ইত্যাদি বলে ডাকি তাহলে অন্যরাও এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিবে। কিছুক্ষণ কথা বলতে বলতেই হুজুর জানালেন তাঁর শহরে যাওয়ার প্রোগ্রামের কথা। নাশতা সেরে চলে এলাম। হুজুর বললেন, দুয়েকদিনের মধ্যে যওক সাহেব এলে যেন আমি আমার সিদ্ধান্তের কথা তাঁকে জানাই। আর যখন যা প্রয়োজন নির্দ্বিধায়

যেন তাঁকে বলি এবং দরকার হলে তাঁর দফতরে যাই।

দুদিন পটিয়ায় বসে থেকে বেশ আড়ষ্ট লাগছিল। সবচেয়ে বড় কষ্ট ছিল যওক সাহেব হুজুরকে এখনও স্বচক্ষে না দেখা। আব্বার কাছে যার নাম শুনে শুনে মনে কল্পনা করে রেখেছি তাঁর সাক্ষাতে এসে দুদিন ধরে তাঁর শূন্য কামরায় অপেক্ষা করছি। এই তৃষ্ণা, কৌতূহল ও অপেক্ষা ছিল অনেক কষ্টদায়ক। এরই মধ্যে ঢাকা থেকে বিশেষ কোন কাজ নিয়ে যওক সাহেব হুজুরের কাছে পটিয়া এসেছেন ভাই মাওলানা সাউদুল হক নদভী। ইনি মরহুম খতীব উবায়দুল হক সাহেবের পুত্র। বাংলাদেশের প্রথম নদভী। আমাদের কিছু সিনিয়র। সাউদুল হক সাহেব পটিয়া গিয়েই বললেন, আমার অনেক তাড়া। হুজুর যেখাইে থাকুন সেখানেই আমাকে যেতে হবে। অতএব হুজুরের বাড়ি চেনেন এমন একজন শিক্ষার্থী সাথে নিয়ে সাউদুল হক নদভী যখন আনোয়ারা রওয়ানা হন তখন আমি আর বসে থাকি কী করে। তাদের সহযাত্রী হয়েই পটিয়া থেকে চট্টগ্রাম শহর হয়ে পতেঙ্গা, সেখান থেকে সাম্পানে চড়ে কর্ণফুলী পাড়ি দিয়ে আনোয়ারা পৌঁছি। সমুদ্রের মোহনায় প্রশস্ত ও ঊর্মিময় কর্ণফুলী ছিল যথেষ্ট ভীতিপ্রদ। আমি অনেক ঘাবড়ে গিয়েও সবার সাথে নদী পাড়ি দিলাম। কিন্তু পরে যতবার এ নিয়ে ভেবেছি ততবারই ভয়ে আমার গা শিউরে উঠেছে এবং ফেরার পথে যওক সাহেব হুজুর আমাদের অভয় দিয়ে শান্ত সময়ে নদী পার করিয়ে শহরে এনেছিলেন। যওক সাহেব হুজুরের এমদাদ মঞ্জিল নামক এই বাড়িতে তিনি আমাদের আন্তরিক মোবারকবাদ জানান এবং অল্প সময়ের মধ্যে ভালো মেহমানদারী করেন। আতপ চালের ভাত, মুরগীর ঝাল ফ্রাই ও ভাজা মাছ সেদিন খুব মজা করে খাই। শুকানো আমের ফালি লবণ-পানিতে ভিজিয়ে তৈরী সিরকা, যা চট্টগ্রামে ঘরে তৈরী হয় প্রথম সেখানেই দেখি।

পটিয়ায় ফিরে এসে শুনি কিছুদিনের মধ্যেই আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী প্রথমবারের মত বাংলাদেশে আসবেন। সে সফরের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি নিয়েই সউদুল হক নদভী কথা বলতে এসেছেন। তখন যওক সাহেব হুজুর বললেন, পটিয়ায় কিছুদিন থেকে সুযোগ হলে তুমি নদওয়ায় চলে যাও। যাওয়ার আগে আমার কাছে থেকে মুতালাআ কর। ভর্তি দেখানোর প্রয়োজন হলে আদব বিভাগে ভর্তি হও। মুফতী সাহেব হুজুরের তত্ত্বাবধানে পূর্ণ ইফতা পড়ার সময় তুমি পাবে না। যে কোন সময় নদওয়া যাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে। এরপর অল্প কিছু দিনই আমার পটিয়ায় থাকা হয়েছিল। কিন্তু এই সামান্য সময় আমি পটিয়াকে যেভাবে পেয়েছিলাম আর পটিয়া মাদরাসাও আমাকে যেভাবে আপন করে নিয়েছিল তা বহু বছরেও অনেকের বেলায় সম্ভব হয়ে উঠে না।

আবার ফিরে আসি মুফতী সাহেব হুজুরের আলোচনায়। তখনকার মাদরাসা পটিয়া তার সুনাম, সুখ্যাতি ও জৌলুসে ছিল অতুলনীয়। ছিল হাজী সাহেব হুজুরের নিষ্ঠা ও এখলাসের বারিধারায় বিধৌত। ছিল একদল প্রাচীনপন্থী খাঁটি দরবেশ আলেমের ছায়াশীতল আশ্রয়। এর মধ্যে খুব অর্থবহ ও আকর্ষণীয় ছিল মুফতী আব্দুর রহমান সাহেবের পরিচালনা ও নেতৃত্ব। হুজুরের কর্মকৌশল ও জীবনশৈলী অনেকের কাছেই ছিল দুর্বোধ্য। সুতরাং আলোচনা-সমালোচনা দুটোই ছিল। আমি সবাইকে দেখতাম আমার নিজের উদার, সহজ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। পটিয়ায় কিছুদিন থাকার সময়েই সেখানকার বিশিষ্ট সব মুরুব্বির কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ আমার হয়। বিশেষ করে নিভৃতচারী দরবেশ উস্তাদদের ক্ষণিক সান্নিধ্য হলেও আমি তা সৌভাগ্য মনে করে গ্রহণ করতাম। মুফতী সাহেব হুজুর একবার তাঁর কামরা থেকে মসজিদে যাওয়ার পথে আমাকে বললেন, একবার তাঁর সাথে দেখা করতে। আমি তখন হুজুরের সাথে দেখা করতে তাঁর অফিসে গেলাম। তিনি তখন বললেন, সেদিন তাড়াহুড়া করে শহরে চলে গেলাম। আপনার সাথে কথাই বলা হল না। এখন বলুন, কেমন আছেন, কী করছেন, কোন অসুবিধা হচ্ছে কি না? আমি তখন তাঁর ব্যবহারে একই সাথে মুগ্ধ এবং বিস্মিত। হুজুরের প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে বললাম, হুজুর আপনার চলাফেরা, কাজকর্ম ও ব্যক্তিত্ব আমার বেশ ভাল লাগে। কিন্তু অনেকের মনেই দেখি আপনাকে নিয়ে নানা প্রশ্ন। এসবের কারণ কী? প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে কী এসব দূর করা যায় না? আপনি কি এসব বিষয় জানেন? আর জানলে পরিবেশ স্বাভাবিক করতে কোন উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন মনে করেন কি না? হুজুর একটি লাজনম্র হাসি দিয়ে বললেন, আপনি খুবই বিচক্ষণ তরুণ। কয়েকদিনের মধ্যে আমার দুঃখ-কষ্ট আর পটিয়ার অবস্থা আপনি বুঝে নিয়েছেন। যাক, আপনার কথায় আমি খুব খুশি হয়েছি। এখন বলুন, আমার ব্যাপারে আপনি কী কী শুনেছেন। শত চেষ্টা করেও আমি সবার মনের প্রশ্ন ও সংশয় দূর করতে পারব না জানি তথাপি আপনার মনে যেন কোন অস্পষ্টতা না থাকে সেজন্য আপনার প্রশ্নের জবাব আমি দেব। এতে আমার মনের দুঃখ-কষ্ট কমবে। নিজের জীবনের প্রতি যে অভিমান জমে আছে তা কিছুটা হলেও লাঘব হবে। এরপর

তিনি নিজেই একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলতে শুরু করলেন। প্রশ্ন-সন্দেহ-সংশয় এ সবই আমার জানা। আপনি সচেতন মানুষ হিসেবে খুব দ্রুত এসব সম্পর্কে ধারণা পেয়ে গেছেন। আর নিজের সরলতা ও খায়েরখাহির গুণে আমাকে এসব বলছেন। আবার নিজের ভদ্রতা ও আভিজাত্যের দরুন প্রশ্নগুলো মুখেও আনতে চাচ্ছেন না। অতএব আমি নিজেই এসবের বিবরণ দিয়ে যাই।

হুজুর বললেন, আলেমদের মধ্যে বহু লোক আছেন যাদের মানসিকতা দুঃখজনকভাবে খুবই সংকীর্ণ। যে পরিবেশ থেকে তারা এসেছেন বা যে পরিবেশে তারা জীবন যাপন করেন তার সীমাবদ্ধতা থেকে তারা কিছুতেই মুক্ত হতে পারেন না। আমি কিছু মানুষের অন্যায় ধারণার শিকার। কিছু লোক থাকেন প্রতিদ্বন্দ্বী, কিছু থাকেন বিদ্বেষী। তাদের অহেতুক সংশয় ও শত্রুতারও আমি ভুক্তভোগী। প্রকৃতই আমার দোষ-ত্রুটি থাকলে যারা আমার বড় বা হিতাকাঙ্ক্ষী তারা যেকোন সময় আমাকে বলতে পারেন, সংশোধন করতে পারেন। আর ভুল-ত্রুটি মানুষমাত্রেরই আছে। কিন্তু আমার যোগ্যতা-মেধা-প্রতিভা কাজে না লাগিয়ে আমাকে পঙ্গু বানিয়ে রাখা বা আমার জীবনকে অর্থবহ হতে না দেয়ার চেষ্টায় লেগে থাকা, এ কেমন রীতি?

আমি বললাম, হুজুর! আমি যার কাছেই যাই তার জীবন থেকেই শিক্ষণীয় কিছু খুঁজি। আপনি আমাকে নিজ অভিজ্ঞতা থেকে কিছু বলুন। হুজুর বললেন, মানুষ কী বলল, তা নিয়ে বেশি ভাবা উচিত নয়। পেছনের দিকে তাকিয়ে থেকে কেউ প্রতিযোগিতায় প্রথম হতে পারে না। নিজের কাজ একাগ্রচিত্তে করে যেতে হবে। কে কী বলল, তা শুনতে হবে তবে মনোযোগ রাখতে হবে নিজের কাজের দিকে। আমি বললাম, সাধারণত প্রশ্ন উঠে, আপনার চলাফেরার শানশওকত নিয়ে। তখন হুজুর এক এক করে সব বিষয়েই কথা বললেন। শুরুতেই বললেন, দেখুন, দেশের যেকোন বিশিষ্ট নাগরিক মাদরাসার দায়িত্বশীলদের চেয়ে বহু গুণ বেশী শানশওকতে থাকে। আমাদের আলেমসমাজ অতি দীন-হীন পরিবেশে থাকাটাই পছন্দ করেন। আমিও এর ব্যতিক্রম নই। তবে পটিয়া মাদরাসার যে অবস্থান ও পরিচিতি দেশে-বিদেশে বর্তমান সময়ে হয়েছে তার সাথে খাপ খাইয়ে এই মাদরাসাকে উপস্থাপন না করলে এর কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাছাড়া মানুষ একটু পরিচ্ছন্ন থাকবে, ভাল কাপড়-চোপড় পরবে, সুন্দর ব্যাগ-ব্রিফকেস ব্যবহার করবে, নিজের ঘরে ভাল বিছানা, আসবাব রাখবে এটি তো শরীয়তে নিষিদ্ধ নয়। আর পটিয়ায় আমি যত উন্নত জিনিসপত্র সংগ্রহ করি তাতো আমার ব্যক্তিগত নয়। আমার এই অফিসেই দেখুন, এখানে যা কিছু আছে সবই তো মাদরাসার সম্পদ। যদি আমি চলে যাই তাহলে গায়ের জামা, মাথার টুপি, রুমাল ও নিজস্ব কিছু কিতাব ছাড়া আর কিছুই আমি নেব না। তাহলে যারা পরিচছন্ন ও উন্নত পরিবেশকে শানশওকত বলেন তারা একটু ভেবে দেখলেই বিষয়টির বাস্তবতা বুঝবেন। প্রসঙ্গক্রমে বললেন, দেখুন, আমি সকালে 'বেলা বিস্কুট' দিয়ে চা খাই। কিন্তু অতি সাধারণ শিক্ষক এমনকি অনেক ছাত্রও স্যুপ, পরোটা, মিষ্টি ইত্যাদি দিয়ে নাশতা করে। আমাকে লোকে দেখে যে, আমার জামা, জুতা, ব্যাগ সুন্দর, আমি সম্ভব হলে গাড়িতে যাতায়াত করি, আমার নিজের কিছু উপার্জন আছে। এর অর্থ এই নয় যে, আমি কোন নিয়ম-নীতি ভঙ্গ করেছি। অতি সাধারণ পরিবারের সদস্য এবং খুব সাদাসিধা জীবন নিয়ে আমি দশজন আলেমের মতোই আছি। যদি আমার কোন বৈশিষ্ট্য থেকে থাকে তাহলে তা নিয়মনীতি ও শরীয়তসম্মতরূপেই আছে। পটিয়া মাদরাসার উন্নয়ন, উস্তাদ ও কর্মীদের বেতন, ছাত্রদের জন্য নানামুখী ব্যয় নির্বাহ করার জন্যই আমার যত চেষ্টা ও উদ্যোগ।

আমি হুজুরের এই সাফাই বক্তব্য শুনে একরকম লজ্জায় পড়ে গেলাম। বললাম, হুজুর! আমাদের দেশেই কোন রুচিশীল সৌখিন আলেম দেখে মানুষ বিস্মিত হয়। কিন্তু অন্যান্য দেশে বহু আলেমই অনেক বিত্তবান ও শানশওকতপূর্ণ। নির্দোষ পন্থায় হালাল উপায়ে প্রাচুর্যের অধিকারী হওয়া সেসব দেশে দোষের কিছু নয়। আমাদের দেশে মানুষ আলেমদের বিত্তবান ও প্রভাবশালী হিসাবে দেখে অভ্যস্ত নয়। একজন আলেম বা মুফতী সাহেবকে তার সহকর্মীরাও ভিন্ন রকম দেখতে সহজবোধ করেন না। যেজন্য সমস্যাগুলো তৈরী হয়। এরপর তিনি নিজের বহুমুখী প্রতিভা, পরিশ্রমী ছাত্রজীবন, কর্মজীবনের দক্ষতা, স্বপ্ন, পরিকল্পনা, সাফল্য, ব্যর্থতা ইত্যাদি নিয়ে অনেক কথাই বললেন। বললেন, যদি আমি চট্টগ্রামের মানুষ না হয়ে ঢাকার বাসিন্দা হতাম তাহলে সারা দেশে আমার গ্রহণযোগ্যতা হতো। যদি আমি পাকিস্তান বা ভারতের লোক হতাম তাহলে লাহোর, করাচি ও দেওবন্দের যেসব মুফতী ও আলেমকে এ দেশের মানুষ মাথায় তুলে রাখে আমাকেও তারা সেভাবে রাখত। কিন্তু এদেশের মানুষ নিজের দেশের প্রতিভাকে মূল্যায়ন করতে জানে না। হাদীস ও ফিকহের উপর আমার যে দক্ষতা ও ব্যাপক পড়াশোনা তা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কোন বিদেশী আলেমের তুলনায় কম

নয়। ছাত্রজীবনে যারা আমাদের তুলনায় অনেক পেছনে ছিল ভারত-পাকিস্তানের হওয়ায় তারা আজ সমাজে পরিচিত ও সমাদৃত। অথচ আমরা অনেকেই তাদের চেয়ে মেধা ও অধ্যয়নে সেরা হয়েও অন্ধকারে পড়ে আছি।

এ সময় পটিয়া মাদরাসায় কোন গাড়ি ছিল না। মাদরাসায় সম্ভবত এখনো নেই। সদ্য বাজারে আসা একটি ছোট্ট সুজুকি মারুতি মাদরাসায় দেখলাম। হুজুরকে শহরের বিদ্যোৎসাহী কিছু প্রবীণ গাড়ি পাঠিয়ে আনা নেয়া করতেন। আমি একদিন বললাম, হুজুর! আপনি নিজে বা মাদরাসার জন্য গাড়ি কিনলে খুব ভালো মডেলের দামি গাড়ি কিনবেন। এসব সস্তা ও ছোট গাড়ি দেখলে মধ্যপ্রাচ্যের ব্যবসায়ী ও শেখরা পটিয়া মাদরাসাকে গুরুত্ব দেবে না। হুজুর তখন অনেকটা হেসেই জবাব দিলেন, আপনি ছাড়া এভাবে কেউ বলে না। নতুন গাড়ি দেখে বিরূপ মন্তব্যই বেশি হয়। আমি এই নীতিতে বিশ্বাস করি, আর বিশ্বাস করি বলেই পটিয়া মাদরাসার মেহমানখানা যথেষ্ট উন্নত করে তৈরি করছি। গোটা মাদরাসাটিই একটি সুদৃশ্য বৃহৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মডেল। এরপর আর তার সাথে বহু বছর দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। আমি চলে যাই নদওয়ায়। এর মধ্যে হুজুর পটিয়া ছেড়ে ঢাকা চলে আসেন।

কয়েক বছর বিদেশে থেকে আমি হযরত আল্লামা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভীর পরামর্শে আমার মুরব্বী ও শায়েখ হযরত আল্লামা যওক সাহেব হুজুরের কাছে জানতে চাই যে, আমি এখন কী করব? হুজুর পত্র লিখেন, পড়াশোনা শেষ করে দেশে ফিরে আস। বাবা মায়ের সঙ্গে একটু দেখা করে দ্রুত এসে চট্টগ্রামে দারুল মাআরিফে যোগ দাও। আরবিতে লেখা পত্রে হুজুর লিখেছিলেন– اسرع من برق خاطف বিদ্যুতের চেয়ে দ্রুত, তড়িৎ গতির চেয়েও তরা করে এসো। দারুল মাআরিফ সে বছরই শুরু হয়। পাঁচ বছর আমি দারুল মাআরিফে তাখস্সুসসহ বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষকতা, নেসাব, নেযাম, তালিমাতের কাজ ও যওক সাহেব হুজুরের চিন্তা-চেতনার প্রসারে নিয়োজিত থাকি। এরপর পারিবারিক কারণে চট্টগ্রাম ছেড়ে ঢাকা চলে আসতে হয়।

এরপর তিরিশ বছরেরও বেশি সময় কেটে গেছে। মুফতি সাহেব হুজুর পটিয়া ছেড়ে চলে আসার পর কোথায় যাবেন কী করবেন এসব বিষয়ে তার ভাবনা বা পরামর্শ এসব কিছুই আমি জানতাম না। শুধু দূর থেকে শুনতাম তিনি কী করছেন? এর মধ্যে বাংলাদেশে খুব বড় একটি ব্যবসায়ী গ্রুপ বসুন্ধরার আহমদ আকবর সোবহান সাহেবের আহ্বানে হুজুর বসুন্ধরায় চলে আসেন। বসুন্ধরা গ্রুপের পরম সৌভাগ্য যে, তারা পার্থিব উন্নতির শিখরে উঠার পাশাপাশি দীনি লাইনেও বেশ অগ্রসর। ফকীহুল মিল্লাতের মত একজন বড় আলেম ও সমাজ-সেবক পেয়ে তারা নিজেদের ধন্য মনে করতে পারে। হুজুরের পরিকল্পনা অনুযায়ী বসুন্ধরায় বিশাল মাদরাসা, ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, মারকাজুল ফিকরিল ইসলামী ও ইসলামিক ইকোনমিক সেন্টার বসুন্ধরার সুখ্যাতিকে চিরস্থায়ী রূপ দিয়েছে। শুনেছি আহমদ আকবর সোবহান ওরফে শাহ আলম সাহেব একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, হুজুর! কে কখন মারা যায় আল্লাহ ছাড়া তা কেউ বলতে পারে না। আপনি যখন মারা যাবেন তখন কবর কোথায় হবে? হুজুর জবাব দিয়েছিলেন, কোন আলেম যখন দীনের কাজের জন্য নিজ জন্মস্থান ও পরিচিত জগৎ ছেড়ে নতুন জায়গায় চলে আসেন তখন সেটি এক ধরনের হিজরতের মতই। অতএব মৃত্যুর পর কর্মস্থলেই তাকে রেখে দেয়া উচিত। তখন বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান বলেছিলেন, তা হলে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় আমরা যত্নসহকারে একটি কবরস্থান নির্মাণ করব। মৃত্যুর পরও আপনি আমাদের সাথে এখানেই থাকবেন। বসুন্ধরা ছেড়ে যাবেন না। তকদীরও এরকমই ছিল। হুজুর এখন বসুন্ধরা কবরস্থানেই শেষ নিদ্রায় শায়িত।

বুড়িগঙ্গার ওপারে মাওয়া সড়কের পাশে বসুন্ধরা রিভারভিউ সিটিতে হুযুর আরেকটি বিশাল জামিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া দেশের উত্তরাঞ্চল, দক্ষিণের শেষ সীমানা ও দেশব্যাপী বিভিন্ন স্থানে তার নির্দেশনা, তত্ত্বাবধান, দুআ ও সহযোগিতায় বহু মসজিদ-মাদরাসা পরিচালিত হত। কর্মজীবনের শুরুর দিকে দীর্ঘদিন বগুড়া থাকায় উত্তরবঙ্গে বেশ জানাশোনা ছিল। বৃহত্তর চট্টগ্রামে তার অনেক ভক্ত ও অনুরাগী ছিলেন। বহু দিন চট্টগ্রাম শহরের শোলকবহর মাদরাসাটিও তিনি পরিচালনা করেন।

আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন চট্টগ্রামের পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে ক'বছর আগে তিনি আমাকে চট্টগ্রামে দাওয়াত করেন। সকালে শুলকবহর মাদরাসায় পৌঁছে তার সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে সাথে নিয়ে নাশতা করেন। সন্ধ্যায় জমিয়তুল ফালাহ ময়দানে আলোচনায় অংশগ্রহণ করি। আরব, ভারত ও অন্যান্য দেশের মেহমানদের পাশাপাশি পাকিস্তানের তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেতাও সম্মেলনে এসেছিলেন। তাঁর বক্তৃতার অনুবাদ আমাকে করতে হয়। রাতেই আমি ফিরে আসি। মুফতি সাহেব হুজুরের কাছে বিদায় নিতে গেলে তিনি মঞ্চে উপবিষ্ট যওক সাহেব হুজুরকে বলেন, মাওলানা উবায়দুর রহমান খান সাহেবের পথখরচের জন্য

হাদিয়াটুকু আমার পক্ষ থেকে আপনি দিয়ে দিন। এসবই আজ পুণ্যময় স্মৃতি।

এঘটনার কিছু দিন পর হুজুরের পক্ষ থেকে আমাকে বসুন্ধরা রিসার্চ সেন্টার দেখতে যাওয়ার দাওয়াত করা হয়। রাজধানীতে থাকা সত্ত্বেও নানা ব্যস্ততার জন্য বসুন্ধরা যেতে আমার অনেকটাই দেরি হয়ে যায়। যখন যাই তখন এর বিশালত্ব, সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য দেখে মুগ্ধ হই । হুজুর তখন কিছুটা অসুস্থ। দুতলার যে রুমটিতে হুজুর বসতেন সেখানে গিয়ে সাক্ষাৎ করি, বিভিন্ন বিষয়ে হুজুর কথা-বার্তা বলেন। মাসিক আল-আবরার সম্পর্কে অনেক আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবং তার নিজস্ব খাবার থেকে আমাকে আপ্যায়ন করেন।

এরপর হুজুরের আহবানে একদিন বসুন্ধরার তিন দিন ব্যাপি উলামা সম্মেলনে মাযহাবের গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা উপলক্ষে যাওয়া হয়। সেদিন মসজিদভর্তি উলামায়ে কেরাম, হুজুরের খুলাফা ও সালিকীনগণ সমবেত ছিলেন। চা-নাশতার পর সকাল সাড়ে নয়টা থেকে এগারটা পর্যন্ত দেড় ঘণ্টা আমার বয়ান হয়। পুরোটা সময় হুজুর ইজি চেয়ারের মত আধশোয়া হুইল চেয়ারে করে মসজিদ পর্যন্ত এসে মেহরাবের কাছে বসে থাকেন। খুব তাওয়াজ্জুহর সাথে আলোচনা শোনেন ও দুআ করতে থাকেন। আমিও সেদিন বেশ তথ্য ও তত্ত্বহুল আবেগপূর্ণ আলোচনা করি। জোহরের নামাযের পর মেহমানখানায় বিশিষ্ট উলামা, বড় ব্যবসায়ী ও রাজধানীর বেশ কিছু অভিজাত ব্যক্তি একসাথে খানা খেতে বসেন। হুজুর আমাকে সবার সাথে বসতে বারবার মানা করছিলেন আর কিসের যেন অপেক্ষা করছিলেন বিষয়টি বুঝতে না পেরে হুজুরের নিজের কামরায় বসে রইলাম। একটু পরই হুজুর মেহমানখানায় গিয়ে তাঁর হুইল চেয়ারের পাশে একটি ছোট্ট দস্তরখান বিছাতে বললেন। টিফিন ক্যারিয়ার ও হটপটে আনা তেল-মশলা কম দেয়া তরকারি সাদা ভাত দিয়ে আমাকে খেতে দেয়া হল। হুজুর বললেন, পোলাও, বিরিয়ানী ও ঝাল গোশত আপনি খেতে পারবেন না। আপনি এসব খানা খান। হুজুর তখন বায়োকেমিক ও হোমিও অষুধ মিলিয়ে অনেকগুলো অষুধ খেলেন। বললেন, অষুধের পর একটু দেরি করে কিছু খেতে হয়। অতএব আপনাদের সাথে বসতে পারলাম না। এরপর আমার তাড়া থাকায় হুজুরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসি। মুফতি এনামুল হক কাসেমীকে দায়িত্ব দেন আমাকে বিদায় জানানোর। পটিয়ার রিজওয়ান রফিক জমিরাবাদীকে দায়িত্ব দেন আল-আবরারের বিশেষ সংখ্যার জন্য আমার একটি বাণী সংগ্রহের। বাণীটি আমি খুবই ভক্তিভরে দিয়েছিলাম। নিকটবর্তী কোন সংখ্যায় ছাপাও হয়েছিল। শুনেছি, হুজুর এতে খুব খুশি হয়েছিলেন। এরপর আর তার সাথে দেখা করার সুযোগ পাইনি।

হুজুরের স্মরণীয় খিদমতের মধ্যে একটি, আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন সংস্থা গঠন। চট্টগ্রামের সার্কিট হাউজ ময়দানে যে বছর প্রথম আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন শুরু হয় সে সময় আমি চট্টগ্রামে ছিলাম। সে বারই প্রথম মাওলানা আব্দুল মাজীদ নদীম এদেশে আসেন। তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতা ও অতুলনীয় উপস্থাপনা প্রত্যক্ষ করে প্রথমেই মুগ্ধ হই। সার্কিট হাউজ ময়দানের সম্মেলনে সে বছরই মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান একটি অনন্য ভাষণ দেন। মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব মুসলিম জনসাধারণের শিক্ষা-দীক্ষা ও দীনি ফায়েদার জন্য এই সম্মেলন দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবছর অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। শরীয়া আইন গবেষণা, অর্থনৈতিক মাসলা-মাসায়েল অনুশীলন, বাতিল ফেরকার মোকাবেলা ইত্যাদি তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করেন। ইলমী যোগ্যতা ও প্রবণতা থাকায় আলেম ও মুফতী তৈরিতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। প্রতিভা ও গুণের কদর করতেন। কাজের লোক বাছাই করে তাকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিতেন। উদারতা ও দানের হাত ছিল। কোন লোককে সম্মান জানাতে দ্বিধান্বিত হতেন না। আধুনিক শিক্ষিত লোকেরা তাকে শ্রদ্ধা ও সমীহ করত। তাদেরকেও তিনি কাছে টানতে জানতেন।

একবার এক সাংবাদিক তার কাছ থেকে ঘুরে এসে আমায় বলেছিলেন, আলেমদের মধ্যে এতো উদার ও অতিথিপরায়ণ মানুষ আমি আর দেখিনি। আরেকবার এক সাংবাদিক তার সাথে বগুড়া বেড়াতে যায়। হঠাৎ তার ঢাকা ফিরে আসার প্রয়োজন হলে হুজুর তাকে একটি গাড়ি করে পাঠিয়ে দেন। এটি ছিল তার কল্পনার বাইরে। কোন মন্ত্রী-এমপি-শিল্পপতি বা কথিত বড়লোকও তাকে এভাবে গাড়ি দেয়নি। সে ভেবেছিল, হুজুর বড়জোর তাকে হয়তো এসি বাসের একটি টিকেটের ব্যবস্থা করে দিবেন। দেশ-বিদেশের বহু নামী-দামী লোক হুজুরের এই উদারতা, বদান্যতা, আদর-আপ্যায়ন, সৌজন্য ও আচরণে মুগ্ধ হয়ে চিরদিনের জন্য তার গুণগ্রাহী হয়ে আছেন।

আল্লামা তকী উসমানী তাঁর দাওয়াতে যতবার বাংলাদেশে এসেছেন প্রতিবারই এসব সফর ও কর্মসূচী বিশেষ গুরুত্ববহ প্রমাণিত হয়েছে। হুজুরের তত্ত্বাবধানে বহু দীনি গ্রন্থ নানা ভাষায় প্রকাশিত হয়। একবার সৌদিআরবে এক মজমায় হজের কিছু মাসআলা নিয়ে খানিকটা বিতর্কের সৃষ্টি হলে মুফতী সাহেব হুজুরের তাহকীক সামনে এনে আমি বিতর্কের অবসান ঘটাই। কারণ, এসব বিষয়ে পুরাতন ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গির দ্বন্দ্ব লেগেই আছে। মুফতী সাহেবের মধ্যে

আমি পুরনো মূল্যবোধের সাথে আধুনিক বিশ্লেষণ সমন্বয় করে সময়ের চাহিদা মেটানোর মনোভাব খুঁজে পাই।

ছোট্ট নিবন্ধে সব কথা বলা সম্ভব নয়। তাঁর প্রায় শতবর্ষী বর্ণাঢ্য জীবন, নানামুখী দীনি কার্যক্রম ও সফল সাধনা বর্ণনা করতে বিশাল পুস্তক রচনা প্রয়োজন, যা তাঁর একান্ত ভক্ত, ছাত্র, সন্তান, সহকর্মী ও নৈকট্যশীল লোকেরা করতে পারেন। আমি দূর থেকে তাকে যতটুকু দেখেছি, জীবনে মাত্র চার-পাঁচবারের সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতে জেনেছি, তার কিছু অংশ এই স্মৃতিচারণমূলক নিবন্ধে তুলে ধরলাম।

২০১৫ সালের ১০ নভেম্বর বারিধারায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম চলাকালে আকস্মিক হুজুরের ইন্তেকালের সংবাদ পাই। যদিও দুদিন পর হুজুরকে তাঁর রোগশয্যায় দেখতে যাওয়ার একটি প্রোগ্রাম বেফাক অফিসে বসে আমরা কয়েকজন ঠিক করেছিলাম। কিন্তু আল্লাহর মরজি ছিল ভিন্ন। যে জন্য আজ রাতেই আমরা তাকে দেখতে যাচ্ছি রোগশয্যায় নয়, অন্তিমশয্যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা বসুন্ধরায় পৌঁছে যাই ততক্ষণে বহুলোক ছুটে এসেছেন। মাদরাসার সামনেই দেখা হয় হুজুরের বড় সাহেবযাদা মুফতী আরশাদ রহমানীর সাথে। তিনি পিতার বিয়োগ ব্যথায় ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন বটে তবে আলেম-উলামাদের সাথে সাক্ষাৎ ও নানা বিষয়ে নির্দেশনার কাজটিও তাকে কান্না থামিয়ে করতে হচ্ছিল। একই অবস্থা তার ছোট ভাইয়ের। পিতার স্নেহের ছায়া মাথা থেকে উঠে যাওয়ার কষ্ট চাপা দিয়ে জরুরি কাজে ছুটোছুটি, কর্মীদের পরিচালনা ও মোবাইলে কথা বলার ভেতরেও তার শিশুর মত কেঁদে উঠা দেখে আমি নিজেও আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ি। মুফতী এনামুল হক, মুফতী সুহাইলসহ অন্যান্য যিম্মাদারদেরও একই অবস্থা। আমাকে তারা হুজুরের লাশ দেখার জন্য দুতলায় নিয়ে গেলেন। তখন গোসল দেয়ার প্রস্তুতি চলছিল। হুজুরকে এক নজর দেখলাম। কল্পনায় ভেসে উঠলো আগে দেখা ফকীহুল মিল্লাতের বর্ণিল নানা রূপ। নীল আরবীয় জুব্বা, পূর্ণ দৈর্ঘ পাগড়ি, উপরে সাদা রুমাল, রোল গোল্ডের মিশ্র মোটা ফ্রেমের চশমা, পাওয়ারের উপর শ্যাডো গ্লাস, কাঁচা-পাকা দীর্ঘ ঘন দাড়ি, রাশভারি পদক্ষেপে হেঁটেচলা পটিয়ার মুফতী সাহেব হুজুর। ইসলামী মহাসম্মেলনের মঞ্চে সাদা দামি জুব্বার উপর বাদামি অথবা অ্যাশ কালারের ভারি সুয়েটার। যথারীতি সেই বিশাল পাগড়ি উপরে সাদা রুমাল। এরপর ঢাকায় হুইল চেয়ারে অথবা মেডিকেটেড বিছানায় সাদা পোশাকে সেই পাগড়ি, সেই রুমাল, সেই ব্যক্তিত্বময় চেহারা। এবার দাড়ি পূর্ণ শুভ্র, দীর্ঘ সুন্দর ভ্রু দুটোতে সামান্য কালোর মিশেল। সেই স্নেহমাখা মুখ, মায়াময় কথা ও আপন জনের মত সম্বোধন চলচ্চিত্রের মত একে একে সব দৃশ্য আমার চোখে ভেসে উঠছিল। আমি খানিকটা স্মৃতি মেদুরতায় আক্রান্ত হয়ে পড়ছিলাম। এরই মধ্যে আযান হল এশার। ঘণ্টাখানেক থেকে এশার নামায শেষে বাসায় ফিরে এলাম। পরদিন সকালের দিকে জানাযায় যেতে হবে। সারাদেশ থেকে মোবাইল আসতে লাগল। বসুন্ধরায় অভূতপূর্ব বিশাল জানাযায় এতো বিপুল সংখ্যক আলেম-উলামা, পীর-মাশায়েখ, ছাত্র-জনতা ও বিশিষ্টজন জমায়েত হন। এ এলাকার আর কোন জানাযায় এত মানুষ শরীক হয়েছেন বলে ইতিহাসে পাওয়া যায় না। আশপাশের এলাকায় তো বটেই মিডিয়ায় প্রচারিত হওয়ায় জানাযার ছবি দেখে ও সংবাদপত্রের রিপোর্ট পড়ে অনেকেই জানতে পেরেছেন যে, এত বড় একজন মনীষী আলেম ও সংস্কারক ব্যক্তিত্ব রাজধানীর বসুন্ধরায় ছিলেন। অনেকেই মন্তব্য করেছেন, এমন একজন মুরব্বী এখানে ছিলেন তা তো আমরা আগে জানতে পারলাম না।

সরকারের এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি আমাকে ফোন করে বললেন, রাজধানীর অভিজাত এলাকায় কোন আলেমের জানাযায় এতো মানুষ হতে পারে তা অনেকেই বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু মুফতী সাহেব হুজুর সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলেন। আমি যখনই বসুন্ধরায় যাই প্রতিবারই সড়কের মাথায় ফলকে উৎকীর্ণ ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান সড়ক লেখাটি দেখে গর্ববোধ করি। মনে হয়, ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মূল ভবনের সম্মুখস্থ যে রাস্তাটি গোলাপ শাহ মাজার থেকে ঢাকা মেডিকেলের দিকে গিয়েছে এর নাম হাফেজ্জী হুজুর সড়ক এবং জেলখানা থেকে চকের দিকে মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খান সড়ক রয়েছে। এছাড়া রাজধানীতে বিশিষ্ট উলামা-মাশায়েখ ও বরেণ্য বুযুর্গদের নামে কোন সড়ক নেই বললেই চলে। আশা করি ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ভবিষ্যতে বিশিষ্ট আলেমদের নামে সড়ক, চত্বর ও উদ্যানের নামকরণ করবে। উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আনিসুল হক ফকীহুল মিল্লাতের জানাযায় উপস্থিত ছিলেন। আর রাজধানীর মানুষ অল্প দিনের ব্যবধানে শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক ও মুফতী ফজলুল হক আমীনীর দুটি জানাযা দেখে ধারণা করতে পেরেছে যে, জানাযায় কতো মানুষ হতে পারে। এর আগে হযরত হাফেজ্জী হুজুর ও খতীব সাহেব রহ. এর জানাযায় যেমন নেমেছিল পবিত্র হৃদয় লাখো মানুষের ঢল। মহান আল্লাহ হযরত ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান সাহেবকে ক্ষমা করে দিন। তাঁকে জান্নাতের সুউচ্চ মাকাম দান করুন। তাঁর প্রতিষ্ঠান ও খেদমতসমূহ কবূল করে নিন।

লেখক : বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, দার্শনিক আলেমে দ্বীন, ইতিহাস রাষ্ট্র ও সমাজতত্ত্ববিদ

আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ায় হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) স্মরণে
‘জলসায়ে যিকরে খায়র’ ও দু’আ মাহফিল

মাও. রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

হযরত ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)-এর ইন্তেকাল পুরো মুসলিম উম্মাহের জন্য অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনায়ক একটি অধ্যায়। এর কারণে দুঃখকাতর হয় বিশ্বের সকল দ্বীনি হলকা। বিশেষ করে উলামায়ে কেরাম ও তালিবে ইলমগণ এহেন শোকাবহ অবস্থায় হয়ে পড়ে বিপর্যস্ত। এর প্রভাব বিস্তৃত হয় দুনিয়াজুড়ে। প্রতিটি অঙ্গন থেকে উলামায়ে কেরাম, পীর-মাশায়েখ এবং হযরতের মুহিব্বীন যথাসম্ভব খবরাখবর নিতে থাকেন। প্রেরণ করতে থাকেন তাঁদের বেদনাহত শোকবার্তা ও হৃদয়পোড়া অভিব্যক্তি। অনেকে বিভিন্ন মিডিয়ায় লেখা ও আর্টিক্যাল প্রকাশের মাধ্যমে তাঁদের দুঃখ-ব্যথার কিছুটা হলেও নিবারণের চেষ্টা করেন। দেশ-বিদেশের অনেক উলামায়ে কেরাম এবং তালিবে ইলম বিভিন্ন ভাষায় কবিতা, কসীদা এবং শেয়ের রচনা করে নিজেদের ব্যথাতুর চিত্তকে সামান্য হলেও সান্ত্বনা দেওয়ারও চেষ্টা করেন। ইতিমধ্যে অনেকে বাংলা ভাষায় শোকগাথার বই প্রকাশ করে উৎসর্গ করেছেন হযরতের শানে।

উপমহাদেশের অন্যতম বৃহৎ দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ায় রয়েছে শেয়ের-শায়েরী, কবিতা আবৃত্তি ও রচনার একটি স্বতন্ত্র বিভাগ। এই বিভাগের অধীনে বিভিন্ন ভাষায় কবিতা রচনা, কবিতা প্রতিযোগিতা এবং শেয়েরও শায়েরীভিত্তিক শোকসভা ও দু’আ মাহফিল আয়োজন করা হয়। যার মাধ্যমে তালিবে ইলমদের সাহিত্য চর্চার বিকাশ ঘটে।

কিছুদিন পূর্বে জামিয়া পটিয়ার মহাপরিচালক হযরতুল আল্লাম মুফতী আব্দুল হালীম বোখারী সাহেব দা. বা. জামিয়ার মুশায়েরা বিভাগকে ‘হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর যিকরে খায়র’ শিরোনামে অনুষ্ঠান আয়োজনের নির্দেশ দেন। বড় আশ্চর্যের বিষয়, কয়েক দিনের নোটিশে হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর স্মৃতিচারণা ও দু’আমূলক শত শত কবিতা জামিয়া পটিয়ার উক্ত বিভাগে জমা হয়ে যায়। বিভিন্ন ভাষায় রচিত এসব কবিতা-কসীদা লেখেন দেশ-বিদেশের বরেণ্য উলামায়ে কেরাম এবং তালিবে ইলমগণ। জামিয়ার মুশায়েরা বিভাগের পরিচালক মাওলানা আব্দুল জলীল কওকব সাহেব অতি অল্প সময়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে উক্ত কবিতা-কসীদাগুলো নজরে সানী এবং সম্পাদনাপূর্বক গত ২৩ জানুয়ারি ২০১৬ জামিয়া পটিয়ার দারুল হাদীসে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

সত্যিই এ অনুষ্ঠান ছিল অভাবিত, অভূতপূর্ব এবং ঐতিহাসিক। দেশের বরেণ্য ও বিখ্যাত শত শত উলামায়ে কেরাম এবং হাজারো তালিবে ইলম অংশ নেন এই অনুষ্ঠানে। সকলে যেন অশ্রুসজল, বেদনার্ত এবং বিয়োগব্যথায় আত্মহারা-আত্মভোলা। হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-কে হারিয়েছেন তো তাঁরা যেন হারিয়ে ফেলেছেন দুনিয়া-আখেরাতের এক বিশাল সম্পদ, হারিয়েছেন পিতৃতুল্য অভিভাবক, দ্বীনি ও আধ্যাত্মিক রাহবর। সকলে দু’আ আর কান্নারত। চিন্তা-বিষাদের চিহ্ন উপস্থিত সকলের মুখাবয়বে। একেকজনের পক্ষ থেকে কবিতা আবৃত্তি করা হচ্ছে আর পুরো মজমা যেন হযরত ফকীহুল মিল্লাতের কীর্তি, অবদান-কোরবানী এবং স্মৃতিগুলো একেক করে চিত্রায়িত করছেন তাঁদের চিত্তপটে। মুহূর্তগুলোতে এক অনন্য আবেশ পরিগ্রহ করছিল জামিয়া পটিয়ায়।

অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয় পৃথক পৃথক তিনটি অধিবেশনে। প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয় বাদ আসর। এই অধিবেশনে উপস্থাপিত হয় তালিবে ইলমদের কবিতা এবং কসীদা। এতে সভাপতিত্ব করেন জামিয়া পটিয়ার সিনিয়র মুহাদ্দিস ও তাফসীর বিভাগীয় প্রধান শারেহুল হাদীস আল্লামা রফীক আহমদ সাহেব দা. বা.।

দ্বিতীয় তথা মূল অধিবেশন আরম্ভ হয় বাদ মাগরিব। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বিশ্বনন্দিত আরবী সাহিত্যিক আল্লামা সুলতান যওক নদভী দা.বা.। প্রধান অতিথি ছিলেন জামিয়া পটিয়ার মহাপরিচালক হযরতুল আল্লাম মুফতী আব্দুল হালীম বুখারী দা.বা.। সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে হযরত আল্লামা সুলতান যওক নদভী দা.বা. অদম্য আবেগকে আর কাবু করতে না পেরে মনোব্যথাক্লিষ্ট নিজ রচিত কবিতা-কসীদাটি নিজেই আবৃত্তি করতে থাকেন। তাঁর প্রতিটি ছন্দবিধৌত অশ্রুধারায় যেন ভাসছিলেন নিজে এবং পুরো মজমা। তিনি বলেন, হুজুর আমার শরহে আকাইদের উস্তাদ। তিনি ছিলেন ছাত্র গড়ার কারিগর। এই জামিয়ার প্রাক্তন মহাপরিচালক আল্লামা হারুন ইসলামাবাদীও তাঁর হাতের গড়া। আজ তিনি নেই। তাঁর ইন্তেকালে আমি পিতৃতুল্য অভিভাবককে হারিয়েছি।

প্রধান অতিথির ভাষণে জামিয়াপ্রধান বলেন, হযরত মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব যুগের যেকোনো ফেতনাকে অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা অনুভব করতে পারতেন বহু আগে থেকেই। যথারীতি পূর্বে থেকেই তিনি উম্মতকে সে ব্যাপারে সতর্ক ও সচেতন করতেন। ফলে শত্রু

তো বটেই, অনেক সময় আপনদের রোষানলেও পড়তে হতো তাঁকে। তবে তিনি কোনো সময় এসবের পরোয়া করতেন না।

কর্মময় জীবনে দেশ-বিদেশে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য তাঁর সর্বব্যাপী খেদমাত রয়েছে। বিশেষ করে জামিয়া পটিয়ার জন্য তাঁর শ্রম ও কোরবানী বর্ণনাতীত। জামিয়া পটিয়ার প্রতিটি বালিকণায় তাঁর অজস্র অবদানের চিহ্ন বিদ্যমান।

আরো বক্তব্য রাখেন হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর বড় সাহেবজাদা মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশের মহাপরিচালক মুফতী আরশাদ রহমানী, সুদূর নাটোর থেকে আগত মাওলানা মুহাম্মদ শিহাবুদ্দীন, হযরতের ছোট সাহেবজাদা সেন্টার ফর ইসলামিক ইকোনমিকস বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক মুফতী শাহেদ রহমানী প্রমুখ।

মুফতী আরশাদ রহমানী তাঁর বক্তব্যে হযরত ফকীহুল মিল্লাতের যিকরে খায়রের লক্ষ্যে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করায় জামিয়া পটিয়ার মহাপরিচালক হযরতুল আল্লাম মুফতী আব্দুল হালীম বোখারী দা.বা., জামিয়ার মোশায়েরা বিভাগের প্রধান ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনপূর্বক বলেন, হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর গোটা জীবনের মেহনত ছিল সুন্নাতে নববীর প্রচার-প্রসার ও সমাজের সর্বস্তরে তা বাস্তবায়নের জন্য। আজ এখানে উপস্থিত শত শত উলামায়ে কেরাম যদি এই প্রতিজ্ঞা করি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা সুন্নাতে রাসূল (সা.)-এর বাস্তবায়নের চেষ্টা করব তবে আমি মনে করি এই আয়োজনের সফলতা তাতেই।

মাহফিল উপলক্ষে বিভিন্ন মাদরাসার জিম্মাদার, শায়খুল হাদীস, মুহাদ্দিস, আসাতিযা এবং তালিবে ইলমগণ কসীদা পেশ করেন। তাঁরা হলেন বিশ্বনন্দিত আরবী সাহিত্যিক হযরতুল আল্লাম সুলতান যওক নদভী দা.বা., পরিচালক জামিয়া দারুল মাআরিফ আল-ইসলামিয়া চট্টগ্রাম ও চেয়ারম্যান ইত্তিহাদুল মাদারিস বাংলাদেশ। শায়েরে হাকীকত আল্লামা মুহাম্মদ হানীফ রাগেব, শায়খুল হাদীস জামিয়া দারুসসুন্নাহ হিলা, কক্সবাজার। আল্লামা আব্দুর রহীম আনওয়ারী, মুহাদ্দিস জামিয়া মাদানিয়া শুলকবহর, চট্টগ্রাম। আল্লামা ইসহাক ভারপ্রাপ্ত মুহতামিম জামিয়া ইসলামিয়া মেহরিয়া শরফভাটা, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম। মাওলানা একরাম হোসাইন অদূদী, মুহাদ্দিস জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া। মাওলানা মুহাম্মদ শফী সূফী প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম মদীনাতুল উলূম মাদরাসা তুলাতলী, টেকনাফ, কক্সবাজার। মাওলানা ওলীউল্লাহ কাসেমী বস্তবী সাহারানপুর ইন্ডিয়া। মাওলানা শফীকুল ইসলাম শায়েক মুহাদ্দিস জামিয়া মাদানিয়া শুলকবহর চট্টগ্রাম। মাওলানা আব্দুল মতীন বোখারী মুহাদ্দিস জামিয়া মাদানিয়া শুলকবহর চট্টগ্রাম। মাওলানা নূরুল হক মুহাদ্দিস জামিয়া মাদানিয়া শুলকবহর চট্টগ্রাম। মাওলানা নিজামুদ্দীন শিক্ষা বিভাগীয় পরিচালক জামিয়া কোরআনিয়া রাঙ্গুনিয়া চট্টগ্রাম। মাওলানা কারী আব্দুল মাবুদ তাজবীদ বিভাগীয় নাজেম মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বসুন্ধরা, ঢাকা। মাওলানা মুফতী কিফায়াতুল্লাহ মুহতামিম জামিয়া ইসলামিয়া টেকনাফ ও সম্পাদক মাসিক 'আল-আবরার'। মাওলানা আব্দুল জলীল কওকব মুহাদ্দিস ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় পরিচালক জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া চট্টগ্রাম। মাওলানা হাফীজুল্লাহ মুহাদ্দিস জামিয়া মাদানিয়া শুলকবহর চট্টগ্রাম। মাওলানা আজীজুল হাসান সিনিয়র শিক্ষক ইউনুসিয়া মাদরাসা মধুনাঘাট, রাউজান, চট্টগ্রাম। মাওলানা মুফতী শফী কাসেমী মুহাদ্দিস জামিয়া ইসলামিয়া (জামীল মাদরাসা) বগুড়া। মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী নির্বাহী সম্পাদক মাসিক 'আল-আবরার'। মাওলানা মুহাম্মদ জাফর সাদেক শিক্ষক জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম। মাওলানা আনওয়ার হোসাইন আজহারী মুহাদ্দিস জামিয়া উবায়দিয়া নানুপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। মাওলানা রহমতুল্লাহ সিপাহী উস্তাদ মাদরাসা ফতহুল ইসলাম মদুনাঘাট, রাউজান, চট্টগ্রাম। মাওলানা জায়নুল আবেদীন শিক্ষা বিভাগীয় পরিচালক জামিয়া ইসলামিয়া টেকনাফ, কক্সবাজার। মাওলানা মুফতী হাফেজ বুরহান উদ্দীন উস্তাদ জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া। মাওলানা আজীজুদ্দীন মুহতামিম আজিজিয়া মাদরাসা পুকখালী কক্সবাজার। মাওলানা মুহাম্মদ শরীফুল ইসলাম উস্তাদ জামিয়াতুল আবরার ঢাকা। মাওলানা হুসাইন টেকনাফী ফাজিল জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া। মাওলানা মুফতী শওকত ইবনে হানীফ সিনিয়র উস্তাদ জামিয়া উবায়দিয়া নানুপুর। মাওলানা কবীর আহমদ প্রতিষ্ঠাতা মাদরাসা আনাস ইবনে মালেক টেকনাফ, কক্সবাজার। মাওলানা আব্দুর রহীম ফরাজী উস্তাদ জামিয়া ইসলামিয়া টেকনাফ। মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস, উস্তাদ দারুস সুন্নাহ হিলা কক্সবাজার। মাওলানা মুফতী মামুনর রশীদ উস্তাদ জামিয়া ইসলামিয়া টেকনাফ। মাওলানা মুফতী জাহেদুল ইসলাম উস্তাদ মারকাযুল বুহুসিল ইসলামিয়া কক্সবাজার। মাওলানা আবু শাহ মুহাম্মদ আজীজুল ইসলাম শিক্ষা বিভাগীয় পরিচালক এমদাদুল উলূম মাদরাসা খরন্দীপ বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম। মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস উস্তাদ জামিয়া ইসলামিয়া, টেকনাফ। মাওলানা এরশাদুল্লাহ উস্তাদ মারকাযুল বুহুসিল ইসলামিয়া, কক্সবাজার।

তালিবে ইলমদের মধ্যে যাঁরা কবিতা পেশ করেছেন তাঁরা হলেন মাও. আলী মুরতজা, সরওয়ার কামাল হাসরত মহিষখালী, মাও. ফয়জুল্লাহ সীতাকুণ্ড, মাও. মিনহাজুদ্দীন, মাও. হেলালুদ্দীন উখিয়া, মাও. মুহাম্মদ ইলিয়াস বাঁশখালী, মাও. মীযানুর রহমান, মাও. আইয়ুব নযীর, মাও. মুহাম্মদ সায়ফুল্লাহ মোরাদাবাদ, মাও. আযীযুল হাসান

আনওয়ারা, মুহাম্মদ শমসুল হক, মুহাম্মদ নূর মুস্তফা, মুহাম্মদ আব্দুল খালেক, মাও. আসেম (হযরতের দৌহিত্র), মাও. ওলিউল্লাহ সিরাজী, মাও. মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন, মাও. মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন খালভী, মাও. মিযানুর রহমান বাঁশখালী, মাও. ফয়জুল্লাহ সীতাকুণ্ড, মাও. যুবাইর উখিয়াবী, মাও. হেলালুদ্দীন, মাও. মাহফুজ রাঙ্গুনিয়া, মুহাম্মদ আযীযুল হক আবরারী, মুহাম্মদ তাওহীদ বাঁশখালী, মাও. ইয়াকুব বাঁশখালী, মাও. যুন নুরাইন সাতকানিয়া, মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ কক্সবাজার, মুহাম্মদ শাকের লোহাগাড়া, মুহাম্মদ আব্দুর রহমান টেকনাফ, মুহাম্মদ নুরুল আবসার, মুহাম্মদ আব্দুল মন্নান, মুহাম্মদ আব্দুর রহীম কুতুবী, মুহাম্মদ নুমান পোকখালী, মুহাম্মদ গোফরান (হযরতের দৌহিত্র), মুহাম্মদ আরশাদ কৈগ্রাম, মুহাম্মদ জসীমুদ্দীন শিলখালী, মুহাম্মদ ফরীদুল আলাম মহিষখালী, মুহাম্মদ জাহেদ সাতকানিয়া, মুহাম্মদ জসীমুদ্দীন ধাওনখালী, মুহাম্মদ একরাম বিন আইউব, মুহাম্মদ এরফান চকরিয়া, মুহাম্মদ আবু হানীফা মহিশখালী, মুহাম্মদ শাফী ইকবাল বগুড়া, মুহাম্মদ সাদেকুল ইসলাম বগুড়া, মুহাম্মদ তামজীদুল্লাহ ঈদগাহ, মুহাম্মদ মুস্তফা চকরিয়া, মুহাম্মদ আরেফুল ইসলাম, মুহাম্মদ হামীদ হোসাইন, আবুবকর সিদ্দীক জালালাবাদী, মিসবাহুদ্দীন চকরিয়া, ফয়জুল্লাহ পটিয়া, মাহমুদ রাগেব পেকুয়া, রিয়াজুদ্দীন কুতুবী, মুহাম্মদ এরফান পেকুয়া, আরেফুল্লাহ, জাহেদ, হারুনুর রশীদ, নূর হোসাইন, নজমুল হক বগুড়া, আজীমুদ্দীন, সাদেকুল ইসলাম, বদীউল আলম, শাকেরুল্লাহ, ইসমাঈল, উমর ফারুক, মুহাম্মদ সালমান বগুড়া, ইসমাঈল, আইউব আনসারী, হেদায়াতুল্লাহ, ওয়ালীউল্লাহ, মুহাম্মদ শওকত মাহমুদ, মুহাম্মদ নূর মুস্তফা প্রমুখ।

একটি অনন্য মর্সিয়া সংকলন :

জামিয়া পটিয়ার মুশাআরা বিভাগের নিয়মানুসারে অনুষ্ঠানে পঠিতব্য কবিতাগুলোর একটি সংকলন প্রকাশ করা হয়। যেহেতু হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর জীবন-চরিতের ওপর বাংলায় একটি বিরাটকায় স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের পথে সে কারণে সংশ্লিষ্ট বিভাগ আরবী, ফার্সি এবং উর্দূ কবিতাগুলো দিয়েই 'ফকীহুল মিল্লাত' নামে সংকলনটি প্রকাশ করে। প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠার এই সংকলন সত্যিই অনন্য ও অদ্বিতীয় একটি সংকলন।

কিতাবটির সংকলক জামিয়া পটিয়ার মোশায়েরা বিভাগের পরিচালক মাওলানা আব্দুল জলীল কওকব। কিতাবটির সংকলনে তাঁর বিশাল মেহনত ও কোরবানী রয়েছে। 'আল-আবরার' পরিবার তাঁর এবং সংশ্লিষ্ট সকলের শুকরিয়া আদায় করে এবং তাঁদের ধন্যবাদ জানায়।

সংকলক পেশকালামে লেখেন, 'আমি তখন জামিয়া এমদাদিয়া পোকখালীতে জামাআতে চাহারমের ছাত্র। হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) উক্ত মাদরাসায় তাশরীফ আনলেন। কোনো উস্তাদের ইশারায় আমি তাঁর আগমনের ওপর একটি কসীদা লিখলাম এবং তাঁর সামনে তা আবৃত্তি করলাম। হযরত ফকীহুল মিল্লাত তাঁর বক্তব্যে বলেন,' "হাদীস শরীফে আছে কেউ যদি সামনাসামনি প্রশংসা করে তবে তার চেহারায় মাটি নিক্ষেপ করো। তিনি বলেন, আসলে হাদীস শরীফে এরূপ বলার উদ্দেশ্য হলো এরূপ প্রশংসা ও তারীফের কারণে তার অন্তরে গৌরব ও অহমিকা জাগ্রত হওয়ার আশংকা রয়েছে। অধমের তো এমন কোনো যোগ্যতা নেই, যাতে প্রশংসার কারণে অহমিকা ও গৌরব সৃষ্টি হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, কবির প্রতি মাটি নিক্ষেপ করার অর্থ হলো তাকে নিরুৎসাহিত করা। অর্থাৎ কবিগণ হাদিয়া তোহফার আশায় মিথ্যা-বানোয়াট অতিমাত্রায় প্রশংসামূলক শব্দ তাদের কবিতায় ব্যবহার করে। যেমন–প্রাচীন আরব শায়েরদের রীতি ছিল। তারা ক্ষমতাসীনদের নামে অতিমাত্রায় প্রশংসা করে কবিতা লিখতেন এবং উপঢৌকন পেতেন। কবিদের এরূপ উদ্দেশ্য যেন পূর্ণ না করা হয় যাতে আগামীতে তারা মিথ্যা-বানোয়াট কথা না লেখে। হাদীসের উদ্দেশ্য এটিই।

মূলত আমাদের মাদরাসাসমূহে কবিতা ও শেয়েরও শায়েরীর বিভাগ রাখা হয় সাহিত্য চর্চার জন্য। কিছুদিন পূর্বে আমাদের জামিয়া পটিয়ায় হযরত খতীবে আজম সাহেবের ইন্তেকালে জামিয়ার ছাত্ররা বহু কসীদা লেখেছেন। খুব সুন্দর হয়েছে আল হামদুলিল্লাহ। আমি খুব খুশি হয়েছি। যদি আমি মৃত্যুবরণ করি আপনি আমার মর্সিয়া লেখবেন।"

আল্লাহ তা'আলার অসীম রহমত আজ থেকে ৩০ বছর পূর্বে হযরত যাঁকে মর্সিয়া লেখার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন আজ তাঁর হাতেই হযরতের পুরো মর্সিয়া সংকলনটি প্রকাশিত এবং অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হলো।

জনাব সংকলক সাহেব তাঁর পেশকালামে যাঁদের শুকরিয়া জ্ঞাপন করেছেন তাঁদের মধ্যে আমাদের সকলের উস্তাদ প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ, হাদীস বিশারদ হযরতুল আল্লাম মাওলানা রহমতুল্লাহ কাওসার দা.বা.। আলোচ্য সংকলন এবং অনুষ্ঠানের পেছনে তাঁর মেহনত ও আন্তরিক বিস্ময়কর। তিনি ভীষণ অসুস্থাবস্থায়ও অকুণ্ঠচিত্তে এসব মেহনত ও চিন্তা ফিকির মাথায় নিয়ে যাবতীয় দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর দৌহিত্র জামিয়া পটিয়ার ইফতা দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র মাও. আসেম, মাও সরওয়ার কামাল হাসরত, মাও. মিনহাজুদ্দীন, মাও. জসীমুদ্দীন প্রমুখেরও শুকরিয়া জ্ঞাপন করা হয়েছে উক্ত সংকলনে।

আমরা 'আল-আবরার'-এর পক্ষ থেকে সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। এবং সকলের দীর্ঘ হায়াতে তাইয়্যিবা কামনা করি। আমীন।

বের হয়েছে **বের হয়েছে** **বের হয়েছে**

প্রাপ্তিস্থান :

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।
০১৯১২৫৯৩৯১৯

জামিয়া ইসলামিয়া কাসেমুল উলূম (জামিল মাদরাসা) বগুড়া।
০১৭১৮৪০৭২৭৮

জামিয়া মাদানিয়া শুলকবহর, চট্টগ্রাম।
০১৮১৭৭৫০৩৯৮

জামিয়া ইসলামিয়া মাইজদী, নোয়াখালী।
০১৯২৬০১৮৬২৭

জামিয়া ইসলামিয়া টেকনাফ, কক্সবাজার।
০১৮১৭০০৯৩৮৩

জামিয়া করিমিয়া জুম্মাপাড়া, রংপুর।
০১৭১৫৩৬১২৪২

ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার কক্সবাজার।
০১৮১৬০০০৮১০